আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার চতুশ্চত্বারিংশ গ্রন্থ

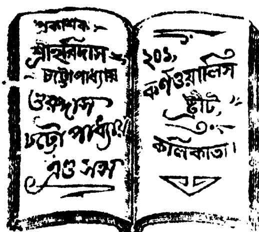
---

# অমিয়-উৎস

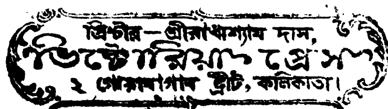
শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

চন্দন নগর

আশ্বিন—১৩২৬


প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।


&
SONS


প্রিন্টার—শ্রীরাধাশ্যাম দাস,
ভিক্টোরিয়া প্রেস,
২ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

# উপহার

# অমিয়-উৎস

## ১

রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় খুলনা জেলা স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া কলিকাতায় পড়িতে আসিয়াছিল। কলিকাতায় একটা মেসে সে আশ্রয় লইল এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ. এ. পড়িতে প্রবৃত্ত হইল। তখন স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ কলিকাতায় যে কোন মেসে থাকিতে পারিত, মেস সম্বন্ধে শিক্ষাবিভাগের বিশেষ বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। তবে ছাত্রের অভিভাবকগণ দেখিতেন যে, যে মেসে ছাত্র আশ্রয় লইল, সেই মেসের অন্যান্য বাবুরা কিরূপ স্বভাবের লোক, তাঁহাদের চরিত্র কেমন ইত্যাদি। যদি সেই মেসে গ্রামবাসী কোন লোক অথবা পরিচিত কোন ব্যক্তি থাকিতেন, তবে অভিভাবকদিগের আর চিন্তার কোন কারণ থাকিত না। রাজেন্দ্রনাথ যে মেসে আশ্রয় লইয়াছিল, সেই মেসে তাহার পিতার পরিচিত একজন ভদ্রলোক থাকিতেন। সুতরাং রাজেন্দ্রনাথের কলিকাতায় অবস্থান সম্বন্ধে তাহার পিতা এক প্রকার নিশ্চিন্ত ছিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় প্রেসিডেন্সি কলেজে বা মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিবার জন্য ছাত্রদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হইত না। যে ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে এণ্ট্রান্স্ পাশ হইত, সে ইচ্ছা করিলেই যে কোন কলেজে প্রবেশ করিতে পারিত। কলেজের অধ্যক্ষ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্রকে আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিতেন। তখন প্রথম শ্রেণীতে এখনকার মত এত অধিক ছাত্র উত্তীর্ণ হইত না, শতকরা দশ বার জন মাত্র প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইতে পারিত, সুতরাং তাহাদের সমাদর না হইবে কেন?

এণ্ট্রান্স পরীক্ষার দুই বৎসর পরে রাজেন্দ্রনাথ এফ. এ. পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইল এবং সেই মেসে থাকিয়াই বি. এ. পড়িতে লাগিল। এই সময় শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী হুগলী কলেজ হইতে এফ. এ. পাশ হইয়া এবং ২০৲ টাকা বৃত্তি লইয়া কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতে আসিল। শরৎও রাজেন্দ্রদের মেসেই আশ্রয় লইল। সুতরাং অতি অল্পদিনের মধ্যেই এই দুই সতীর্থ প্রগাঢ় বন্ধুত্ব-পাশে আবদ্ধ হইল। মেসে উভয়ে একই কক্ষে থাকিত এবং কলেজে একই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত, এরূপ অবস্থায় উভয়ের বন্ধুত্ব যে প্রগাঢ় হইবে, ইহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

এই যুবকদ্বয়ের বন্ধুতা প্রগাঢ় হইবার আরও একটা কারণ ছিল, উভয়েরই আর্থিক অবস্থা প্রায় সমান। রাজেন্দ্রনাথের পিতা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় খুলনা জেলার

একজন ছোট খাট জমিদার। তাঁহার বাসগ্রাম ও তৎসন্নিহিত কয়েকখানি গ্রাম তাঁহার জমিদারীভুক্ত। তাঁহার বার্ষিক আয় দশ বার হাজার টাকা হইবে। ব্রজেন্দ্রনাথ কোন স্কুল-কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ না করিলেও ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষাতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি সহৃদয়, উদার, পরদুঃখকাতর এবং দাতা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রনাথ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, কনিষ্ঠ পুত্র হরেন্দ্রনাথ গ্রামের বঙ্গ-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। যে সময় আমাদের এই আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে, সে সময় রাজেন্দ্রনাথের বয়স ২৩ বৎসর, হরেন্দ্রনাথের বয়স ১৩ বৎসর। ব্রজেন্দ্র বাবুর একটি কন্যাও আছে, সে রাজেন্দ্র অপেক্ষা চার বৎসরের ছোট। বৎসরের অধিকাংশ সময় সে শ্বশুরবাটীতেই থাকিত। মধ্যে মধ্যে পিতৃগৃহে আসিয়া ১০।১৫ দিন বাস করিত।

শরচ্চন্দ্র পিতৃ-মাতৃহীন—এক কথায় অনাথ। তাঁহার পিতা পশ্চিমে বাঁকিপুরে ওকালতি করিয়া যথেষ্ট টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। বাঁকিপুরে বাস করিতে হইত বলিয়া তিনি তথায় একটি সুন্দর উদ্যান-বেষ্টিত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত বাঁকিপুরে আরও তিন চারিখানি বাটী এবং কিছু জমিদারীও করিয়াছিলেন। এই সকল বাটীর ভাড়া এবং জমিদারীর আয়ও বাৎসরিক ১০।১২ হাজার টাকা হইবে। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার ওকালতির আয় হইতেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত

এবং প্রতি বৎসরেই কিছু কিছু সঞ্চয় হইত। শরতের বয়স যখন ১৪ বৎসর, সেই সময় বিসূচিকা রোগে তাহার পিতা এবং ১৫ দিনের মধ্যেই তাহার মাতা লোকান্তরে গমন করিলেন। সংসারে শরতের আপনার জন বলিতে এক বিধবা জ্যেঠাইমা ছাড়া আর কেহই রহিল না।

শরচ্চন্দ্রের পিতা উকীল ছিলেন, সুতরাং তিনি নিজের বিষয়-সম্পত্তির এরূপ সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন যে, তাহা কোনরূপে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তাহার উপর শরতের জ্যেঠাইমাও অসাধারণ বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাঁহার পিতৃকুলে কেহ না থাকাতে তিনি দেবরের সংসারেই গৃহিণী হইয়াছিলেন। শরৎকে তিনি মানুষ করিয়াছিলেন, শরৎও তাঁহাকে "বড়মা" বলিয়া ডাকিত। দেবরের মৃত্যুর পর "বড়মা" বাঁকিপুরের বাস উঠাইয়া স্বামীর পৈতৃক ভিটা— হুগলী জেলায় গোপালপুর গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। গোপালপুরের বাটীও শরতের পিতা সুসংস্কৃত এবং বাসোপযোগী করিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রতি বৎসর পূজার বন্ধের সময় তিনি বাটীতে আসিয়া অতি সমারোহে দুর্গোৎসব করিতেন। বাটীর তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একজন কর্ম্মচারী ছিল, সেই বার মাস প্রভুর বাটী, বাগান, পুষ্করিণী প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করিত।

বাঁকিপুরের বিষয়-আশয় দেখিবার জন্য একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিল, অধিকন্তু বাঁকিপুর পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে

বড়মা, দেবরের শুভানুধ্যায়ী বন্ধু বাবু হরদৎলালকেও বিষয়-আশয় দেখিবার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন। হরদৎলাল একজন ধনবান্ ব্যবসায়ী, তিনি বড়মার কথা শুনিয়া, বালক শরচ্চন্দ্রকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বাষ্প-গদ্গদ-কণ্ঠে বলিলেন, "এই বালক বড় হইয়া যত দিন নিজের বিষয়-সম্পত্তি বুঝিয়া লইতে না পারিবে, তত দিন ইহার সম্পত্তির একটি পয়সাও বাজে খরচ হইবে না, নষ্ট হইবে না।" হরদৎ বাবুর এই প্রতিশ্রুতি মুখের কথাতেই পর্য্যবসিত হয় নাই, অক্ষরে অক্ষরে কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। শরৎ বড়-মার সঙ্গে দেশে ফিরিয়া আসিলে বাবু হরদৎলাল তাহার বিষয়-সম্পত্তির তত্বাবধান করিতে লাগিলেন এবং সেই সম্পত্তির আয় হইতে প্রতিমাসে তিন শত টাকা বড়মার নিকটে পাঠাইয়া অবশিষ্ট টাকাতে শরতের নামে কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিতে লাগিলেন। যে বৎসর শরৎ এফ, এ, পাশ দিয়া হুগলী হইতে কলিকাতায় পড়িতে গেল, সেই বৎসর তাহার কোম্পানির কাগজের মূল্য প্রায় এক লক্ষ টাকা হইয়াছিল।

২

যথা সময়ে রাজেন্দ্রনাথ ও শরৎ উভয়েই সম্মানের সহিত বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'ল' পড়িতে প্রবৃত্ত হইল। রাজেন্দ্রনাথের সহিত শরতের তিন বৎসর হইল আলাপ-

পরিচয় হইয়াছে। এই তিন বৎসরের মধ্যে রাজেন্দ্র দুইবার গোপালপুরে শরতের বাটীতে বেড়াইতে গিয়াছিল। হুগলী জেলার আম বিশেষ বিখ্যাত; বিশেষতঃ শরতের পিতা অনেক যত্নে, নানা স্থান হইতে অতি উৎকৃষ্ট আমের কলম আনাইয়া আপনার বাগানে রোপণ করিয়াছিলেন। তিনি জীবিত থাকিতে থাকিতেই অনেকগুলা গাছ ফলিতে আরম্ভ হইয়াছিল, এখন সকল গাছেই আম হয়। শরৎ সেই আম খাওয়াইবার জন্য বন্ধুকে প্রতি বৎসরেই নিমন্ত্রণ করিতেন। রাজেন্দ্রনাথ দুইবার গ্রীষ্মাবকাশের সময় গোপালপুরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। গোপালপুরে শরতের বাটীতে গিয়া রাজেন্দ্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বন্ধুর বাগানের "শরীরখাস" "হিমসাগর" "ফুলি" "গোপালভোগ" প্রভৃতি অপেক্ষা বন্ধুর বড়মার স্নেহ অনেক মধুর। এমন স্নেহ, এত আদর-যত্ন বুঝি তিনি আপনার জননীর নিকটেও পান নাই।

রাজেন্দ্রনাথ দুইবার গোপালপুরে বন্ধু-গৃহে গমন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শরৎ একবারও রাজেন্দ্রের বাটীতে যাইতে পারেন নাই। ব্রজেন্দ্র বাবুর বাটীতে দুর্গোৎসবে বিশেষ সমারোহ হইত, কিন্তু শরতের বাটীতেও দুর্গোৎসব হইত বলিয়া পূজার সময় তাহার বাটী ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার সুবিধা হইত না। শরৎ মধ্যে মধ্যে মনে করিতেন যে, রাজেন্দ্রনাথের বাটীতে একবার না যাইলে আর চলে না, এইবার যাইতেই হইবে, কিন্তু যাই যাই করিয়াও যাইতে

পারিতেন না। কারণ, কলেজে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে আপনার বিষয়-সম্পত্তিও কিছু কিছু দেখিতে হইত। যদিও বৈষয়িক কার্য্য কর্ম্মচারীদের দ্বারাই নির্ব্বাহ হইত সত্য, তথাপি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহাকেও কিছু কিছু করিয়া কাজ-কর্ম্ম দেখিতে হইত। বাটীতে পূজার গোলমাল শেষ হইয়া গেলে বড়মা তাঁহাকে একবার বাঁকিপুরে গিয়া বাবু হরদৎলালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিতেন। বড়মার আদেশ তাঁহাকে পালন করিতেই হইত। সেই জন্য খুলনা জেলার যোড়াগাছি গ্রামে তাঁহার যাইবার বিশেষ সময় বা সুবিধা হইত না। যাহা হউক, এক বৎসর এই সুবিধা হইল। বৈশাখ মাসের ২০শে তারিখে একদিন শরৎ বাসাতে বসিয়া আছেন, এমন সময় ডাক-পিয়ন আসিয়া তাঁহাকে একখানা পত্র দিয়া গেল। শরতের বাটীর কর্ম্মচারী অথবা বাঁকি-পুরের কর্ম্মচারী ব্যতীত আর কাহারও নিকট হইতে বড় পত্রাদি আসিত না। কখনও কখনও বাবু হরদৎলালের নিকট হইতেও পত্র আসিত। শরচ্চন্দ্র পত্রখানি হাতে লইয়া একটু বিস্মিত হইলেন! কারণ, খামের উপরে স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষরে লেখা ছিল :—

"পরম-কল্যাণীয় শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
বাবাজীবন দীর্ঘজীবেসু।—"

তাহার পর ইংরাজীতে অপরিচিত হস্তাক্ষরে কলিকাতার বাসার নম্বর, গলির নাম প্রভৃতি লেখা ছিল।

এরূপ পত্র শরৎ কখনও কাহারও নিকট হইতে পায় নাই। সুতরাং সে প্রথমে অত্যন্ত বিস্মিত হইল। তাহার পর পত্র উন্মোচন করিয়া দেখিলেন, স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষরে লেখা আছে :—

"বাবা শরৎ,

আমি কি তোর মা নই? তবে তুই আমাকে দেখা দিস্ না কেন? আমি আগে জানিতাম, আমার দুই ছেলে—রাজেন্দ্র ও হরেন্দ্র, এখন জানিয়াছি, আমার শরৎ নামে আর একটি ছেলে আছে। কিন্তু আমি এমন হতভাগী যে, সেই ছেলের চাঁদমুখখানি আজ পর্য্যন্ত চক্ষে দেখিলাম না। হাঁ রে বাবা, আর কতদিন আমার কাছ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে থাক্‌বি? কতদিনে রাজেন্দ্রের সঙ্গে এসে আমাকে মা ব'লে ডাকবি?

আগামী ২৯শে বৈশাখ রাজুর খোকার অন্নপ্রাশন। কর্ত্তার বয়স হইয়াছে, উনি কি আর সকল দিক্ দেখিতে পারেন! তোরা না এলে কে দাঁড়িয়ে থেকে কাজকর্ম্ম দেখবে? আর ছলনা করিস্‌নে বাবা, এবারে আসিস্। আমি পথ পানে চেয়ে আছি, কবে আমার শরৎ ও রাজু বাড়ী আস্‌বে। আস্‌বার সময় রাজুকে সঙ্গে ক'রে আনিস্। ইতি।—

তোমার মা।"

পত্রখানি পাঠ করিবামাত্র শরতের হৃদয় কি যেন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মাতৃহীনের কাছে "মা" অপেক্ষা বুঝি মধুর আর কিছুই নাই। শরতের মনে পড়িয়া গেল—বাঁকিপুরের সেই স্নেহময়ী জননীর মৃত্যু-শয্যার চিত্র। কত দিন শরৎ "মা" বলিয়া ডাকিতে পান নাই। বড়মা? মা থাকিতেও বড়মা ছিলেন, এখনও আছেন, কিন্তু কেবল "মা" ত নাই। বুঝি এতদিন পরে আবার শরৎ মা বলিয়া ডাকিয়া পূর্ব্বেকার সেই আনন্দ লাভ করিবেন। তিনি বার বার স্নেহ-সুধায় সিক্ত সেই পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে দরদর ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল, কিন্তু মাতৃহীন শরতের তাহা বোধ ছিল না, তাঁহার মনে হইল, যেন সারা জগৎ ব্যাপিয়া মাতৃশব্দের এক গভীর ঝঙ্কার উঠিতেছে, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, চেতন অচেতন সকলেই যেন "মা" "মা" রবে চীৎকার করিতেছে, কেবল তিনি একা মূকের ন্যায় নীরবে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার কণ্ঠ হইতে যেন "মা" শব্দ বাহির হইতেছে না। তিনি যেন "মা" বলিয়া ডাকিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কণ্ঠ হইতে কোন স্বর বাহির হইতেছে না! এমন সময় পথে একজন ভিক্ষুক গাহিয়া উঠিল—

"গালভরা মা ডাকে—তোরা মা ব'লে ডাক্
মা ব'লে ডাক্—মা ব'লে ডাক্ মাকে।
মায়ের চরণতলে লুটিয়ে পড়ে আদরে মাকে লুটে—

আমার গান ভেসে যাক—প্রাণ ভেসে যাক,
দেখি শুধু মাকে ; একবার গালভরা মা ডাকে।”

শরচ্চন্দ্র তন্ময় হইয়া সেই পত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া গান শুনিতেছিলেন। গান শেষ হইবামাত্র তিনি কাতরকণ্ঠে “মা” বলিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

৩

মাঠের উপর দিয়া উল্কাবেগে খুলনার ডাক-গাড়ী ছুটিতেছে। গাড়ীর একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কক্ষে রাজেন্দ্র ও শরৎ বসিয়া আছেন। আরও দুই এক জন যাত্রী সেই কক্ষে আছেন। কেহ শিয়ালদহ হইতে, কেহ বা অন্য কোন ষ্টেশন হইতে উঠিয়াছেন। কেহ গাড়ীর শেষ গন্তব্য ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাইবেন, কেহ বা মধ্যবর্ত্তী কোন ষ্টেশনে যাইবেন, আবার কেহ কেহ বা ইতঃপূর্ব্বেই নামিয়া গিয়াছেন। শরৎ পূর্ব্ব-বঙ্গ রেল-পথের কোন স্থানে কখনও যান নাই। কলিকাতার পূর্ব্ব-দিকেও যে জনপদ আছে, লোকালয় আছে, তাহা তিনি কানে শুনিয়াছিলেন, স্বয়ং কখনও দেখেন নাই। তাই তিনি গাড়ীর বাতায়ন দিয়া উৎসুক-নেত্রে অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতেছিলেন। গাড়ীর উভয় পার্শ্বে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ, মাঝে মাঝে তরুরাজী-বেষ্টিত গ্রাম—গাড়ী হইতে কেবল গাছগুলিই দেখিতে পাওয়া

যাইতেছে, কদাচিৎ বৃক্ষশ্রেণীর উপর দিয়া কোন ধনবানের বাটীর কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। কোথাও হোগলাবন, জলা, পদ্মবন, মাঝে মাঝে দুই চারিখানি কুটীর-প্রাঙ্গণে লাউমাচা, কুমড়ামাচা, স্থানে স্থানে শম্বুকের স্তূপ, চুনারীরা জলা হইতে শম্বুক সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, পুড়াইয়া চূণ প্রস্তুত করিবে।

শরচ্চন্দ্র তন্ময় হইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে হইতেছিল—"মা"! তিনি মাতৃদর্শনে যাইতেছেন। না জানি এ মা দেখিতে কেমন? তিনি শৈশবে যে স্নেহময়ী জননীর কোলে শুইয়া স্তনপান করিয়াছিলেন, বাল্যকালে যাঁহার কাছে কত আব্দার করিতেন, কত আদর পাইতেন, কৈশোরে পদার্পণ করিবার পরই তিনি যে মাকে হারাইয়াছেন—এ মা কি সেই মার মত? এ মাকে দেখিতে কেমন? দেখিতে বোধ হয়, অনেকটা রাজেন্দ্ররই মত হইবেন। কেননা, অনেক পুত্রের মুখে মাতৃমুখচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে! কি জানি, এ মা দেখিতে কেমন হইবেন?

শরচ্চন্দ্র রাজেন্দ্রনাথের সহিত কথাবার্ত্তাও কহিতেছেন, হাস্য-পরিহাসও করিতেছেন, কিন্তু যখনই কথাবার্ত্তা বা হাস্য-পরিহাসের বিরাম হইতেছে, তখনই তাঁহার চিত্ত সেই মাতৃ-চিন্তায় বিভোর হইয়া পড়িতেছে। রাজেন্দ্র শরতের এই অন্যমনস্কতা দেখিয়া মনে করিলেন—আমাদের দেশের এই দৃশ্য পশ্চিমবঙ্গবাসীর দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নূতন, তাই বোধ হয়, শরৎ তন্ময় হইয়া মাঝে মাঝে এই দৃশ্য দেখিতেছেন।

যথাসময়ে গাড়ী খুলনা ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। রাজেন্দ্র কুলি ডাকিয়া আপনাদের মালপত্র নামাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বাটীতে ভোজ হইবে, তাই রাজেন্দ্র কলিকাতা হইতে পল্লীগ্রামে দুষ্প্রাপ্য নানা প্রকার খাদ্য এবং পানীয়ের উপাদান সঙ্গে লইয়াছিলেন। ঐ সকল দ্রব্যের কতকগুলি পিতা বা মাতার আদেশে, আবার কতক-গুলি রাজেন্দ্র নিজের ইচ্ছায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শরতের কেবল একটা ব্যাগ ছিল, তাহার মধ্যে কয়েক প্রস্থ বস্ত্র এবং নিত্য ব্যবহার্য্য দুই চারিটা দ্রব্য ছিল।

তিন চারি জন কুলির মাথায় মালপত্র চাপাইয়া দিয়া, ষ্টেশনের বাহিরে আসিলেন। খুলনা হইতে যোড়াগাছি প্রায় চারি ক্রোশ, জলপথে নৌকাযোগে যাইতে হয়। ষ্টেশনের বাহিরে যাইবামাত্র রাজেন্দ্র দেখিলেন, তাঁহাদের কর্ম্মচারী মাধবচন্দ্র তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য দ্রুতবেগে ষ্টেশন অভিমুখে চলিয়াছে। রাজেন্দ্রকে দেখিয়াই মাধব প্রণাম করিয়া বলিল, "এই যে বড় বাবু এসেছেন। শরৎ বাবু সঙ্গে এসেছেন ত? ইনি বুঝি? প্রণাম। আমি বাজারে গিয়াছিলাম, তাই দেরী হয়ে গেল। চলুন নৌকাতে, আমার বাজার করা শেষ হয়েছে।"

এই বলিয়া মাধবচন্দ্র অগ্রে অগ্রে চলিল, কুলিরা মোট মাথায় লইয়া তাহার পশ্চাতে নৌকা অভিমুখে চলিল, আর সকলের পশ্চাতে রাজেন্দ্র ও শরৎ ধীরপদবিক্ষেপে যাইতে

লাগিলেন। মাধব নৌকায় উঠিয়া প্রথমে কুলিদের নিকট হইতে দ্রব্যাদি লইয়া গুছাইয়া রাখিল, তাহার পর নৌকার সম্মুখভাগে একখানা ছোট সতরঞ্চ বিছাইয়া তাহার উপরে একটা ক্ষুদ্র তাকিয়া রাখিয়া প্রভু-পুত্রকে ও তাঁহার বন্ধুকে নৌকায় আরোহণ করিতে বলিল। রাজেন্দ্র নৌকার উপরে বসিয়া পদ ধৌত করিলেন এবং সতরঞ্চের উপরে গিয়া ভাল করিয়া বসিলেন। শরৎও রাজেন্দ্রের পর নৌকায় উঠিয়া রাজেন্দ্রের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। নৌকার ভিতরে নানা প্রকার দ্রব্য পরিপূর্ণ দেখিয়া রাজেন্দ্র বলিলেন,—

"মাধব, এ করেছ কি? নৌকা যে একেবারে বোঝাই ক'রে ফেলেছ, নৌকা নড়বে ত? বোধ হয় বাড়ি পৌছিতে রাত্রি ১০টা হবে।" মাধব করযোড়ে বলিল, "কি করি হুজুর, কর্ত্তার হুকুম, তবু আজ অনেক জিনিস কেনা হ'ল না, কাল আবার এসে নিয়ে যাব। যেতে রাত হবে না, বড় জোর সন্ধ্যা।"

মাঝি নৌকার মুখ ঘুরাইয়া দিয়া বলিল, "সন্ধ্যের আগে এগিয়ে পৌছিব। ভাবনা কি কর্ত্তা, দেখুন না।"

মাঝির কথাই সত্য হইল। দাঁড়ী ও মাঝি প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই যোড়াগাছিতে উপস্থিত হইল। বাবুদের ঘাটে নৌকা লাগিল। নদীর উপরেই প্রকাণ্ড অট্টালিকা, সদর-দ্বারে সম্মুখে উচ্চ বংশমঞ্চের উপর হইতে নহবৎ পূরবী রাগিণী আলাপ করিয়া সন্ধ্যার আবাহন এবং

বাবুদের বাটীতে আসন্ন উৎসবের বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছিল। নৌকা তীরে লাগিবামাত্র চার পাঁচজন ভৃত্য ছুটিয়া আসিয়া প্রভুপুত্র এবং তাঁহার বন্ধুকে প্রণাম করিয়া নৌকা হইতে দ্রব্যাদি উঠাইতে প্রবৃত্ত হইল।

শরৎ রাজেন্দ্রের সহিত অট্টালিকামধ্যে প্রবেশ করিতেই সম্মুখে প্রায় পঞ্চাশৎবর্ষবয়স্ক এক সুশ্রী সবল প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মুখের সহিত রাজেন্দ্রের মুখের সমতা লক্ষ্য করিয়াই শরৎ বুঝিতে পারিলেন—ইনিই রাজেন্দ্রের পিতা—জমিদার ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। রাজেন্দ্রের সহিত শরৎকে আসিতে দেখিয়া ব্রজেন্দ্র বাবু অগ্রসর হইয়া সহাস্যমুখে, বলিলেন—"এস বাবা এস। পথে কোন কষ্ট হয় নি ত?"

রাজেন্দ্র ও শরৎ উভয়ে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। শরৎ উঠিয়া বলিলেন,

"আজ্ঞে না, কষ্ট ত হয় নাই, বরং নূতন স্থানে আসিতে বেশ আনন্দই হইয়াছে।"

ব্রজেন্দ্র বাবু সহাস্যে বলিলেন, "নূতন স্থান সত্য, তবে তোমার আনন্দ হইতে পারে, এমন কিছুই এ দেশে নাই। সামান্য পল্লীগ্রাম।"

শরৎ অবনত মস্তকে বলিলেন,—

"আমার বাড়ীও হুগলী জেলার এক পল্লীগ্রামে, কলিকাতায় বাসাতে থাকি। আমিও পল্লীগ্রামের লোক।"

ব্রজেন্দ্র বাবু এ কথার কোন উত্তর না দিয়া রাজেন্দ্রকে

সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রাজু শরৎকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাও, মুখ-হাত ধুয়ে কিছু জল খাও গে। অনেকটা পথ গাড়ীতে এসেছ, যে গরম—বাপ্! যাও, আর দেরী ক'র না। শরৎ, যাও বাবা; বাটীর ভিতরে যাও। তুমিও যে, রাজুও সে। তুমি ঘরের ছেলে, কোন বিষয়ে কুণ্ঠিত হয়ো না।"

শরৎ ব্রজেন্দ্র বাবুকে প্রণাম করিয়া রাজেন্দ্রের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

৪

সন্ধ্যা সমাগত হইলেও তখনও অন্ধকার হয় নাই। তখন শুক্লপক্ষ বলিয়া আকাশে বেশ আলোক ছিল, কেবল দূরের গাছপালা যেন একটু অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল। ব্রজেন্দ্র বাবুর সদর-বাটীর প্রাঙ্গণে সামিয়ানা খাটান ছিল বলিয়া বাহিরের উন্মুক্ত স্থান অপেক্ষা যেন একটু অন্ধকার বোধ হইতেছিল। কোন কোন গৃহস্থের বাটীতে সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি হইতেছিল।

শরৎ দেখিলেন যে, রাজেন্দ্রদের বাটী অতি প্রকাণ্ড। নদীর ঘাট হইতে ঐ বাটীর সম্মুখভাগ যত বড় দেখিয়াছিলেন, সদর হইতে অন্দরে যাইবার সময় বুঝিতে পারিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে সেই বাটী তাহা অপেক্ষা অনেক বড়। তিন চারিটা মহল পার হইলে তবে সদর হইতে অন্দরে যাইতে হয়। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, রাজেন্দ্রের পিতা এখন একজন "ছোট খাট" জমিদার হইলেও এককালে তাঁহারা বেশ বড় জমিদারই

ছিলেন। অন্দরে যাইবার পথে রাজেন্দ্র শরৎকে লইয়া এক একটা মহল অতিক্রম করিবার সময়, "এইটা দুর্গা-বাড়ী" "এইটা দোলবাড়ী" প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। দুর্গোৎসব বা কালীপূজার সময় দেবীর সম্মুখে বলিদান হয়। কিন্তু বাটীতে যে রাধাবল্লভের বিগ্রহ আছেন, তাঁহার সম্মুখে বলি হইতে পারে না, সেই জন্য দুর্গাবাড়ী ও দোলবাড়ী সম্পূর্ণ পৃথক্। দুর্গাবাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে দুর্গা ও কালী-প্রতিমার "কাটাম" বিদ্যমান। দোলবাটীর দালানে কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত রাধাবল্লভ, অষ্ট-ধাতুনির্ম্মিত শ্রীমতীকে বামে লইয়া বিরাজ করিতেছেন। গোধূলির ঈষৎ অন্ধকারে বিগ্রহদ্বয়ের অঙ্গের রত্নালঙ্কার চক্-চক্ করিতেছিল। রাজেন্দ্রনাথ দুর্গাবাড়ীতে প্রতিমার কাটামকে ও দোলবাড়ীতে বিগ্রহকে প্রণাম করিলেন, শরৎও বন্ধুর দেখাদেখি প্রণাম করিলেন।

অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া রাজেন্দ্র ডাকিলেন—"মা।" শরতেরও ইচ্ছা হইল—তিনিও একবার রাজেন্দ্রের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া তাঁহারই মত একবার মা বলিয়া ডাকেন। কিন্তু কেমন লজ্জাবোধ হইতে লাগিল।

পুত্রের আহ্বান—"মা" শব্দ শুনিবামাত্র এক প্রৌঢ়া হাসিতে হাসিতে একটা কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং শরৎকে দেখিয়া মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিয়া বলিলেন—

"শরৎ এসেছিস্ বাবা? তোকে দেখবার জন্য সেই

সকাল হ'তে পথ-পানে চেয়ে আছি। ছি বাবা, ছেলে হয়ে কি মায়ের প্রতি এত নিষ্ঠুর হ'তে হয় ?"

গৃহিণী যখন কক্ষের দ্বারদেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তখন শরতের মনে হইল, যেন স্বয়ং জগদম্বা মাতৃরূপে সেই স্থানে আবির্ভূতা হইলেন, আর তাঁহার কান্তিতে সমস্ত প্রাঙ্গণটি আলোকিত হইয়া উঠিল। শরতের মুখ দিয়া আর কথা সরিল না, ভক্তিভরে তাঁহার মস্তক সেই দেবীর পদতলে লুটাইয়া পড়িল, তিনি দণ্ডবৎ পতিত হইয়া তাঁহার চরণে স্বীয় মস্তক স্থাপন করিলেন, তাঁহার মনে হইল, বুঝি হাতে করিয়া সে চরণ-রেণু লইয়া মস্তকে স্থাপন করিলে সম্যক্ পরিতৃপ্তি হয় না, সে চরণে যেন মাথা লুটাইতে পারিলেই জন্ম সার্থক হয়। তাঁহার কানে সে সময় কেবল ধ্বনিত হইতে লাগিল—

"মায়ের চরণ-তলে লুটিয়ে পড়ে আন্ রে মাকে লুটে
আমার গান ভেসে যাক, প্রাণ ভেসে যাক,
দেখি কেবল মাকে।"

শরৎ প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, গৃহিণী শরতের চিবুক স্পর্শ করিয়া স্বীয় হস্ত চুম্বন করিলেন এবং বলিলেন,

"বেঁচে থাক বাবা, চিরজীবী হও, এমনি ক'রে তোমরা দুই ভায়ে কেন—তিন ভায়ে জন্ম জন্ম ধ'রে মা ব'লে আমার কোলে এস। হাঁ বাবা, তা এত দিন আস্বিস্ নাই কেন ?"

শরৎ সহাস্যে বলিলেন—

"মা ত আমাকে এত দিন ডাকেন নাই। মা যেমন ডেকেছেন, আমিও অমনি ছুটে মায়ের পায়ে এসে পড়িছি। মা যদি আগে ডাকতেন, তবে আমিও আগে আস্‌তেম।"

গৃহিণী বলিলেন, "তা বলিবি বৈ কি? আমি যে তোকে দিন-রাত ডাকছি, তুই বুঝি তা শুন্‌তে পাস্ নাই?"

শরৎ বলিলেন—

"মা যদি মনে মনে ডাকেন, তাহলে কি ছেলে শুন্‌তে পায়? কিন্তু ছেলে যদি মনে মনে, এমন কি, স্বপ্নেও মাকে স্মরণ ক'রে তাহলেও মা শুন্‌তে পান। তা যদি শুন্‌তে না পান তবে আর মা কি?"

রাজেন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা, তোমরা মায়ে পোয়ে ঝগড়া করো। এখন, আপাততঃ আমাদের কিছু খেতে দাও, ক্ষিদে পেয়েছে—ছেলের ক্ষিদে বুঝ্‌তে পারেন না, এমন মাও কখনও দেখি নাই।"

গৃহিণী একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—

"ও মা, তাও ত বটে, আমি ছেলে পেয়েই আহ্লাদে মত্ত হয়েছি, ছেলের যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে, সে কথা ভুলে গেছি। যা বাবা, উপরে গিয়ে কাপড়-চোপড় ছাড় গে আমি যাচ্ছি।"

এই বলিয়া গৃহিণী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে এক অনিন্দ্য-সুন্দরী যুবতী লজ্জাবনত সহাস্য আস্যে, তথায় উপস্থিত হইল এবং প্রথমে রাজেন্দ্র ও পরে শরৎকে প্রণাম করিয়া উভয়ের পদধূলি গ্রহণ করিল। তাহাকে দেখিয়াই রাজেন্দ্র বলিল—

"কম্‌লি? তুই কবে এলি? কেমন আছিস্? খোকা কোথা? সে কেমন আছে?"

প্রশ্নের পর প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া কমলি—ওরুফে কমলিনী বলিল—

"কাল এসেছি। খোকা ঘুমিয়েছে, সবাই ভাল আছি।"

শরৎ কমলিনীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,

"আমার মা ছিলেন না, মা পেলাম, বোন্ ছিল না, বোন পেলাম—"

বাধা দিয়া কমলিনী বলিলেন—

"ভাই নাই—ভাইও পাবে—ঐ যে বাঁদরটা আস্‌ছে?"

এমন সময় একটি ত্রয়োদশবর্ষীয় সুন্দর বালক ছুটিয়া আসিয়া রাজেন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—

"দাদা, তোমরা এসেছ, তা আমি জান্‌তেম না। সরকার আমাকে বল্লে।"

কমলিনী বলিলেন—

"বাঁদর না বাঁদর—দাদাদের প্রণাম কর্।"

শরৎ বলিলেন, "থাক থাক, আর প্রণাম কর্ত্তে হবে না। চল উপরে যাই।" সকলে উপরে চলিয়া গেলেন। সিঁড়িতে উঠিবার সময়—রাজেন্দ্র লক্ষ্য করিলেন, প্রাঙ্গণের অপর পার্শ্ব-স্থিত দ্বিতলের একটা কক্ষের বাতায়নের পার্শ্বে একখানি সুন্দর অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে ঈষৎ হাসিয়া সরিয়া গেল রাজেন্দ্রের হৃদয় আনন্দে স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

৫

মহাসমারোহে খোকা বাবুর অন্নপ্রাশন হইয়া গেল। যখন খোকা বাবুকে সকলে আশীর্ব্বাদ করিয়া যৌতুক প্রদান করিতে লাগিলেন, তখন শরৎ সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন. রাজেন্দ্র শরতের নিকটেই দাঁড়াইয়া, প্রস্ফুটনোন্মুখ গোলাপ-কলিকার ন্যায় ক্ষুদ্র শিশুটির প্রতি চাহিয়া ছিলেন। কর্ত্তা, গৃহিণী ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ স্বর্ণ-অলঙ্কার ও ধান-দূর্ব্বা দিয়া খোকা বাবুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অবশেষে গৃহিণী শরৎকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—

"শরৎ, তুই ওখানে একধারে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন, বাবা, আয় ধান-দূর্ব্বা দিয়ে রাজুর খোকাকে আশীর্ব্বাদ কর্।"

গৃহিণীর কথা শুনিয়া শরৎ রাজেন্দ্রের বাহুতে একটা চিমটি কাটিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—

"ভাই আমাকে একটা সিকি কি আধুলি ধার দিতে পার?"

"কেন? কি হবে?"

"শুধু ধান দূর্ব্বা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করাটা কি ভাল দেখায়? কিছু যৌতুক দিব না?"

রাজেন্দ্র সেই চিম্‌টির উত্তরে একটি চিমটি কাটিয়া বলিলেন,—

"নাও আর জেঠামি কর্ত্তে হবে না। মা বলছেন, গিয়ে ধান দূর্ব্বা দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর।"

তখন শরৎ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া খোকা বাবুকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহার মুখ চুম্বন করিলেন এবং গৃহিণীর হস্তস্থিত স্বর্ণের রেকাবি হইতে ধান ও দূর্ব্বা লইয়া খোকার মস্তকে স্থাপন করিলেন। গৃহিণী খোকাকে কোলে লইবার জন্য হাত বাড়াইলে শরৎ স্বীয় পকেট হইতে একছড়া রত্নখচিত বহুমূল্য হার বাহির করিয়া খোকার গলায় পরাইয়া দিলেন, এবং পুনরায় খোকার মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে গৃহিণীর ক্রোড়ে সমর্পণ করিলেন।

শরৎকে সেই বহুমূল্য যৌতুক দিতে দেখিয়া সকলেই অতীব বিস্মিত হইলেন। গৃহিণী বলিলেন,

"হাঁরে শরৎ এ আবার কি হল? আমি ধান দূর্ব্বা দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে বল্লেম আর তুই এ কি দিলি বল দেখি?"

শরৎ অত্যন্ত ভাল মানুষটির মত বলিলেন,

"কেন মা, আমিত আপনার কথামত ধান দূর্ব্বা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেছি।"

গৃহিণী বলিলেন,

"তবে এ আবার কি? এ হার দিলি কেন? দু'দিনের তরে বেড়াতে এসে বাছার এ গুণকার কেন বল দেখি?"

শরৎ বলিল—"আমার দোষ নাই মা, আমি রাজেনের কাছ থেকে একটা সিকি কি একটা আধুলি ধার চেয়ে

ছিলেম। ও ধার দিলে না ত কি করব? খোকা বাবুর হাতে যা হয় একটা কিছু দিতে ত হবে।"

শরতের কথা শুনিয়া কক্ষস্থিত সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। রাজেন শরতের বাহু আকর্ষণ করিয়া বলিলেন,

"আর জেঠাম কর্ত্তে হবে না, চল, এখন বাইরে যাই। আচ্ছা আমিও এর শোধ নিতে জানি।"

শরৎ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,

"তাই হ'ক তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। শীঘ্র শীঘ্র যেন তুমি শোধ নিতে পার। আগে ত বিবাহ, তার পরে ত খোকার অন্নপ্রাশন। তুমি যে অন্ধক মুনির মত, আঁটকুড় দশরথ রাজাকে পুত্রশোকের অভিসম্পাদ দিলে।"

কলিকাতাতে শরৎ রাজেন্দ্রের জননীর নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াই স্থির করিয়া ছিলেন যে, যখন অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ তখন বন্ধু পুত্রের জন্য কিছু মূল্যবান যৌতুক লইয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু কি যৌতুক লইবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া প্রথমে মিউনিসিপাল মার্কেটে গমন করিয়া নানা প্রকার খেলনা দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু ছয় মাসের শিশু সে খেলনায় কি করিবে? সুতরাং খেলনা না কিনিয়া রত্নবণিক বদ্রিদাসের দোকানে প্রবেশ করিলেন। দোকানের একজন কর্ম্মচারীর নিকটে স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তিনি শিশুর উপযোগী নানা প্রকার অলঙ্কার দেখাইলেন, কিন্তু শরতের কোন অলঙ্কারই আর পছন্দ হয় না। অবশেষে প্রায় পাঁচশত

টাকা মূল্যের একটি হার পছন্দ করিলেন, এবং সেই হারই গ্রহণ করিলেন।

রাজেন্দ্র এ সংবাদ কিছুই জানিতেন না। মাতার অনুরোধে শরৎ নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য যোড়াগাছিতে যাইতে সম্মত হইয়াছেন, রাজেন্দ্র এইটুকুই জানিতেন। শরৎ যে তাঁহার অজ্ঞাতসারে খোকার জন্য যৌতুক সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং সে যৌতুক বহুমূল্য, রাজেন্দ্রনাথ ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারেন নাই। শরতের প্রদত্ত এই যৌতুকের কথা মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই বৃহৎ পুরীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। সকলের মুখে সেই হারের কথা। কেহ বলিল, "হারের মূল্য এক হাজার টাকার এক পয়সা কম হইবে না," কেহ বলিল, "না অত হইবে না, সাড়ে সাতশত টাকার অধিক হইতেই পারে না।" আবার কেহ বা হারে যে সকল রত্ন নক্ষত্র মালার মত জ্বলিতেছিল, সে গুলির অকৃত্রিমতা-সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া বলিল, "ও সব ভড়ুঙ্গে গো ভড়ুঙ্গে। কলকেতার চাল চলনই এই রকম। ও গুলো সত্যি হীরে মাণিক হলে ওর দাম কত? বোধ হয় পাঁচ হাজার টাকা। ও সব ঝুট, ইত্যাদি।" বলা বাহুল্য যে, যাহারা এইরূপ সমালোচনা করিতেছিল, তাহারা রত্ন ত দূরের কথা, একখানা স্বর্ণালঙ্কারের প্রকৃত মূল্য যে কত হওয়া সম্ভব, সে সম্বন্ধে তাহাদের কোন ধারণাই ছিল না বলিয়াই তাহারা বিশেষ, দৃঢ়তার সহিত নিজ নিজ অভিমতের সমর্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

৬

খোকাবাবুর অন্নপ্রাশনের পর ৪।৫ দিন কাটিয়া গিয়াছে। জমিদার বাবুর বাটীর উৎসব শেষ হইয়া গিয়াছে। যে সকল আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব এই শুভ কার্য্য উপলক্ষে আমন্ত্রিত হইয়া ব্রজেন্দ্র বাবুর বাটীতে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই একে একে স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। কেবল শরচ্চন্দ্র ছুটী পান নাই। তিনি কলিকাতায় যাইবার কথা বলিলে, কর্ত্তা বলিতেন "এত তাড়াতাড়ি কি? থাক না আর দুই চারি দিন।" গৃহিণী বলিতেন, "ওমা এরই মধ্যে যাবি কিরে, এখানে খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি? তা বাছা যদি খাওয়া দাওয়ার কোনরূপ কষ্ট হয় তা আমাকে বলিস না কেন? তুইত একদিনও আমার কাছে আব্দার করে কিছু চেয়ে খেলি না। এখন তোর যাওয়া হবে না।" সুতরাং যাই যাই করিয়াও শরতের আর যাওয়া ঘটিল না। তাঁহাকে থাকিতে হইল।

রাজেন্দ্রনাথ প্রত্যহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "কিহে কলিকাতায় যাবে কবে? এখানে থেকে যে নড়বার নাম কর না তোমার মতলবটা কি?"

শরৎ হাসিয়া উত্তর দিতেন।

"মতলব কিছু না থাকিলে কি এই পাড়াগাঁয়ে আধপেটা খেয়ে পড়ে থাকি? আমরা কলিকাতার ছেলে, এ সব পাড়া-

গাঁয়ে থাকা কি আমাদের সাজে? অবশ্য কিছু মতলব আছে বৈকি।"

শরতের মতলব যাহাই হউক, বিধাতার মতলব যে একটা কিছু ছিল, তাহা রাজেন্দ্র বা শরৎ কেহই জানিতে পারেন নাই। একদিনের একটা ঘটনায় বিধাতার মতলব যেন কতকটা প্রকাশ হইয়া পড়িল।

শরৎ ও রাজেন্দ্র উভয়ে প্রত্যহই অপরাহ্নকালে বেড়াইতে বাহির হইতেন। কোন দিন বাগানে, কোন দিন প্রান্তরে, আবার কোন দিন বা নদীতীরে বেড়াইতে যাইতেন এবং সন্ধ্যার পর বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন।

একদিন অপরাহ্ন কালে দুই বন্ধুতে যথারীতি বেড়াইতে বাহির হইলেন। কোন দিকে যাইবেন, তাহার কিছুই স্থিরতা ছিল না। উভয়ে পাদচারণা করিতে করিতে নদীর তীর ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, গ্রাম হইতে প্রায় এক মাইল দূরে নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, নদীটি সেই স্থানে উত্তরদিক হইতে আসিয়া একটু ঘুরিয়া পশ্চিম মুখে চলিয়া গিয়াছে। যে স্থানে নদী ঘুরিয়া গিয়াছে, সেই স্থানে, নদীর জলের উপরেই দুই তিনটা সুবৃহৎ বটবৃক্ষ ছিল। একটা বৃক্ষের তলদেশ সানবাঁধান ছিল। মধ্যাহ্নকালে রাখাল-বালকগণ নদীতীরে গরুর পাল ছাড়িয়া দিয়া সেই বৃক্ষতলে গাত্রমার্জ্জনী বিছাইয়া শয়ন করিত, দুই, তিন জনে মিলিয়া খেলা করিত। সেইজন্ত সানবাঁধান স্থানটি বেশ পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন ছিল। রাজেন্দ্র ও শরৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং উপবেশন করিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সেই স্থানে নদী ঘুরিয়া গিয়াছিল। তাঁহারা পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিয়া ছিলেন, নদীটি তাঁহাদের বাম দিক হইতে আসিয়া তাঁহাদের দক্ষিণদিক দিয়া পশ্চিমাভি-মুখে প্রবাহিত হইতেছিল। নদীতে স্রোত বিশেষ ছিল না, তবে বৈশাখমাসের দক্ষিণবাতাসে অল্প অল্প তরঙ্গ হইতেছিল।

শুক্ল পক্ষের সন্ধ্যা। সেই বটবৃক্ষের তলদেশে অন্ধকার আর চতুর্দ্দিকে জ্যোৎস্নার আলোক। জ্যোৎস্নালোকে সম্মুখস্থিত নদী তরঙ্গ তুলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছিল, দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ জ্যোৎস্নাস্নাত হইয়া যেন হাসিতে ছিল। সুশীতল দক্ষিণ-পবনে বিগত-শ্রান্তি হইয়া রাজেন্দ্র বলিলেন,

"চল ভাই গিয়া জ্যোৎস্নাতে বসিগে। এমন সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রে অন্ধকারে বসিয়া থাকিলে মন খারাপ হয়।"

শরৎ হাসিয়া বলিলেন,

"কিন্তু আমার মত অন্যরূপ। অন্ধকারে না বসিলে আলোক উপভোগ করিতে পারা যায় না। আলোকের মধ্যে আসিলে আলোকের মর্য্যাদা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। আলোকের সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইলে, অন্ধকার হইতে আলোক দেখাই ভাল।"

রাজেন্দ্র এবং শরৎ উভয়েই বি, এ পরীক্ষায় দর্শন শাস্ত্রে

অনার লইয়া পাশ হইয়াছিলেন, সুতরাং এই দুই দার্শনিক পণ্ডিতের মধ্যে আলোক ও অন্ধকার রহস্য লইয়া মহাতর্ক উপস্থিত হইল। তর্কে কেহই ছোট হইতে চাহেন না। কাজে কাজেই তর্কস্রোত অবাধে চলিতে লাগিল। কতক্ষণ চলিত বলিতে পারি না, কিন্তু শরৎ তর্কের মধ্যে সহসা ক্ষান্ত হইয়া উৎকর্ণ হইয়া যেন কি শুনিতে লাগিলেন।

শরৎকে তর্ক বন্ধ করিতে দেখিয়া রাজেন্দ্র প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যেই শরতের তর্ক বন্ধ করিবার কারণ বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার মনে হইল যেন কে অতি সুমধুর-কণ্ঠে অতি দূরে গান করিতেছে। গানটি এক একবার বেশ স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল, আবার পরক্ষণেই যেন অস্পষ্ট হইতেছিল। অবশেষে উভয়েই বুঝিতে পারিলেন যে হারমোনিয়মের সহিত কণ্ঠস্বর মিলাইয়া কেহ গান করিতে করিতে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। সেই স্বর্গীয় সঙ্গীত যে গতিশীল, তাহা যে দূর হইতে ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তাহা উভয়েই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন।

শরৎ বলিলেন,

"এ পল্লীগ্রামে এমন সুন্দর গান গায় কে? এত রাখাল-বালকের গান নয়, সঙ্গে বাঁশী বা হারমোনিয়মও আছে বলিয়া বোধ হইতেছে।"

রাজেন্দ্র বলিলেন,

"গানটি যেন অতিমধুর বালককণ্ঠের বলিয়া মনে

হইতেছে। বোধ হয় কেহ নৌকায় বসিয়া গান করিতে করিতে আসিতেছে।”

তখন উভয়েই সেই স্থানে বসিয়া যতদূর দৃষ্টি যায়, বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন। বামদিকে কোন নৌকা দেখিতে পাইলেন না। দক্ষিণদিকে নদীটি ঘুরিয়া গিয়াছিল বলিয়া প্রথমে কিছুই দেখিতে পান নাই—পরে একখানা বজরা তাঁহাদের নয়ন-গোচর হইল। তাঁহারা দেখিলেন একখানা বজরা পাল তুলিয়া তরঙ্গমালা চূর্ণ করিতে করিতে পশ্চিম-দিক হইতে তাঁহাদেরই দিকে অগ্রসর হইতেছে। দক্ষিণ-বাতাসে বজরার পাল ঈষৎ ফুলিয়া উঠিতেছে, বোধ হয় মাঝিমাল্লারা জানিত যে সম্মুখের মোড়টা ঘুরিয়া গেলেই বজরা উত্তরাভিমুখে যাইবে তখন পালে জোর দক্ষিণ-বাতাস লাগিবে। সেইজন্য যেন তাহারা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল, বজরা মোড় ফিরিলেই দক্ষিণ-বাতাসের সাহায্য পাইবে!

বজরাটি ক্রমশঃ সেই বটগাছের নিকটবর্ত্তী হইল,—রাজেন্দ্রনাথ জ্যোৎস্নালোকে দেখিলেন, বজরার ছাদের উপর একজন ভদ্রলোক বসিয়া হারমোনিয়ম বাজাইতেছেন, আর একটি বালিকা বা কিশোরী তাঁহার কাছে বসিয়া গান করিতেছে। একটি বালক সাহেবী পোষাক পরিয়া বজরার ছাদের উপরে মাস্তুল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আর একটি স্ত্রীলোক সেই বজরার নিকটে বসিয়া আছেন। বজরাটি রাজেন্দ্র ও শরতের এত নিকটে উপস্থিত হইল যে, তাঁহারা

জ্যোৎস্নালোকে সকলকে বেশ সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহারা অন্ধকারে গাছের ছায়ায় বসিয়া ছিলেন বলিয়া বজরার আরোহীরা তাহাদিগকে দেখিতে পান নাই।

গায়িকা গাহিতেছিল,—

"যে দিন পরাণে তোমার মধুর মূরতি জাগে,
সেদিন অমিয় উৎস বহে হৃদয় মাঝে
সে দিন নন্দন বন কুসুম গন্ধ—
পবন মাখিয়া ধায়—
সে দিন, বন বিহঙ্গ ঢালে সুধারাশি তোমারই অনুরাগে।

সহসা বীণার তার ছিন্ন হইলে যেমন একটা বিকট ঝন্ ঝনা ধ্বনি উত্থিত হয়, সেইরূপ সেই গায়িকার কণ্ঠ হইতে একটা বিকট আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। বজরাটি যে মুহূর্ত্তে মোড় ফিরিল সেই মুহূর্ত্তে পালে জোর বাতাস লাগাতে পালটি সহসা ফুলিয়া উঠিল, বজরা হঠাৎ এক দিকে কাৎ হইয়া পড়িল, আর যে বালকটি মাস্তুল ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে বজরার ছাদ হইতে বৃক্ষের ছায়ায় অন্ধকারে নদী-বক্ষে সবেগে নিক্ষিপ্ত হইল। গায়িকা তাহা দেখিতে পাইয়া সভয়ে চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল!

৭

সন্ধ্যার পর ব্রজেন্দ্র বাবু সন্ধ্যাহ্নিক করিবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দ্বিতলে এক পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র-কক্ষে ব্রজেন্দ্র বাবু ও তাঁহার গৃহিণী প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যার সময়

সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিতেন। পতি-পত্নী উভয়ে একই দিবসে কুলগুরুর নিকট হইতে দীক্ষা-গ্রহণ করিলে গুরুদেব আদেশ করেন যে, "যখনই সম্ভব হইবে, তখনই দুই জনে এক সঙ্গে সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিও। 'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ' এই ঋষিবাক্য যে কেবল যাগ-যজ্ঞাদিতে প্রযোজ্য তাহা নহে, দৈনিক উপাসনাও ধর্ম্মপত্নীর সহিত মিলিত হইয়াই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা উচিত।"

গুরুদেবের এই আদেশ অনুসারে ব্রজেন্দ্রনাথ প্রত্যহ প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যার পর পত্নীকে লইয়া জপের ঘরে প্রবেশ করিতেন এবং উভয়ে একযোগে সন্ধ্যাহ্নিক করিতেন। জপের ঘর একটি ক্ষুদ্র কক্ষ, অতি সুন্দর ও পরিষ্কার। কক্ষের একদিকে দ্বার ও অপর তিন দিকে বাতায়ন। কক্ষ প্রাচীরে কয়েক খানি চিত্র ছিল, তন্মধ্যে একখানি গুরুদেবের, একখানি ব্রজেন্দ্রনাথের জনক-জননীর, ও একখানি তাঁহার পত্নীর জনক-জননীর, অবশিষ্ট চিত্রগুলি দেব দেবীর। গৃহ মধ্যে কোনরূপ অন্য আসবাব ছিল না।

ফলে কক্ষতলে দুইখানি গালিচার আসন ও আসনের সম্মুখে গঙ্গাজলপূর্ণ তাম্র পাত্র। কক্ষের বাহিরে একটি ব্রাকেট-আল্‌নাতে একখানি গরদের শাড়ী ও একটি গরদের যোড় থাকিত। গৃহিণী বস্ত্র-পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক সেই শাড়ী পরিধান করিয়া সন্ধ্যা-দীপ জ্বালিয়া জপ-ঘরে প্রবেশপূর্ব্বক এবং প্রথমে একটা ধুনাচিতে কিঞ্চিৎ ধুনা ও গুগ্‌গুল জ্বালিয়া

দিতেন, তাহার পর কয়েকটী ধূপ জ্বালিয়া দিয়া স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় দ্বারের নিকটে দণ্ডায়মান রহিলেন। ক্ষণকাল পরে ব্রজেন্দ্র বাবু তথায় উপস্থিত হইয়া পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন, গরদের ধূতি পরিধান ও উত্তরীয় সর্ব্বাঙ্গে আবৃত করিয়া জপঘরের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বীয় আসনে উপবেশন করিয়া সান্ধ্যাহ্নিকে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পত্নীও স্বামীর বামপার্শ্বের আসনে উপবেশনপূর্ব্বক আহ্নিক ও জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রায় আধঘণ্টা পরে ব্রজেন্দ্র বাবু উঠিয়া প্রত্যেক চিত্রের কাছে গমনপূর্ব্বক প্রাচীরে কপাল স্পর্শ করাইয়া প্রণাম করিলেন, তাঁহার পত্নীও সেইরূপ প্রণাম করিয়া আসন দুই খানা গুটাইয়া এক পার্শ্বে রাখিয়া দিলেন এবং একটী কুলঙ্গীতে গঙ্গাজলপূর্ণ-তাম্রপাত্র স্থাপনপূর্ব্বক জপঘর হইতে বাহির হইলেন ও কক্ষদ্বারে শিকল লাগাইয়া দিলেন। এই দম্পতীর মধ্যে কেহ পীড়িত না হইলে অথবা কার্য্যানুরোধে বাটী ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে না যাইলে প্রত্যহই এইরূপ ভাবে উভয়ে সন্ধ্যাহ্নিক করিতেন। জপ-ঘরের পরিমার্জ্জন প্রভৃতি কার্য্য গৃহিণী স্বয়ং করিতেন, কোন শূদ্রের সে গৃহে প্রবেশাধিকার ছিল না।

উভয়ে জপঘর হইতে বাহির হইয়া, বস্ত্র পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক অন্য একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এই কক্ষটি ব্রজেন্দ্র বাবুর অন্তঃপুরের বৈঠকখানা। সেই কক্ষে অনেকগুলি গদি-আঁটা-

কৌচ ও চেয়ার ছিল। একটা কৌচের নিকটে মার্ব্বেল পাথরের একটী ক্ষুদ্র টেবিলে একখানি বড় রেকাবিতে নানা প্রকার ফলমুল ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্ররেকাবিতে কয়েকটা মিষ্টান্ন এবং এক গ্লাস জল ছিল। ব্রজেন্দ্রবাবু সেই কৌচে উপবেশন পুর্ব্বক জলযোগে প্রবৃত্ত হইলেন। গৃহিণী সেই কৌচেরই এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বলিলেন,—

"সন্ধ্যা হয়ে গেল রাজু আর শরতের এখনও দেখা নাই।"

ব্রজেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারা এখনও বেড়িয়ে আসেনি? এখনও জল খায় নাই?"

"না,—সেই বৈকাল-বেলা দুজনে বেড়াতে বেরিয়েছে, ছেলেদের খাওয়া দাওয়ার দিকে নজর নাই কেবল বেড়ান।"

ব্রজেন্দ্রবাবু সহাস্যে বলিলেন,—

"শরৎ পূর্ব্বে কখনও আমাদের এখানে আসে নাই, যা দেখে তাই তার নূতন। বেশ ছেলে!"

গৃহিণী বলিলেন,

"অমন সুন্দর ছেলে কখনও দেখিনি। যেমন রূপ তেমনই গুণ। কি অমায়িক। রাজুর অনেক পূণ্য ছিল, তাই শরৎকে বন্ধুরূপে পেয়েছে। শরতের উপরে যে আমার কি মায়া পড়েছে, তা আর বল্‌তে পারিনি। সে যখন মা বলে কাছে এসে দাঁড়ায় তখন ইচ্ছা হয় তাকে কোলে তুলে নিই। আমার রাজুর চেয়ে যেন শরৎকে মিষ্টি লাগে।"

ব্রজেন্দ্রবাবু বলিলেন,—

"আসলের চেয়ে সুদের উপরে মায়া চিরকালই বেশী হয়ে থাকে। আমি রাজুর মুখে শুনেছিলাম যে, শরতের অবস্থা মন্দ নয়। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে যে, তাহার আর্থিক অবস্থা আমাদের অবস্থার চেয়ে ভাল। সে দিন খোকাকে যে হারটা দিয়াছে, তার দাম পাঁচশত টাকার কম হবে না। আর্থিক অবস্থা খুব ভাল না হলে কি আর বন্ধুর ছেলের অন্ন-প্রাশনে কেহ পাঁচশত টাকার হার নিয়ে যৌতুক দিতে পারে ?"

শরতের বিয়ের সময় আমাকেও ঐ রকম যৌতুক কর্ত্তে হবে। শরতের মুখখানি দেখলে আমার বড় প্রাণ কেমন করে। আহা এই বয়স মা নাই, বাপ নাই, রাজুর মুখে শুনেছি এক জ্যেঠাই মা আছেন তিনিই ওকে মানুষ করেছেন। বাছার মা নাই তাই আমাকে যেন ওর মা বলে আর আশ মেটে না। আমাকে যখন মা বলে ডাকে, আমি যেন আহ্লাদে পাগল হয়ে যাই। শরৎ কলিকাতায় গেলে আমার কিন্তু বড় মন কেমন কর্ব্বে। আবার কত দিন পরে এসে মা বলে ডাকবে।"

গৃহিণী একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ব্রজেন্দ্র বাবু জলযোগ শেষ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—

"তাইত ছেলে দুটো এখনও এল না, কোন্ দিকে বেড়াতে গেল ? যাই এক জনকে না হয়, খুঁজতে পাঠিয়ে দিইগে।"

গৃহিণী বলিলেন,—

"তারা নদীর তীরে গেছে। আমাদের গাঁয়ের নদীটি শরতের বড়ই ভাল লেগেছে। দুই জন লোককে নদীর তীর ধরিয়া দুই দিকে পাঠিয়ে দাওগে, দেখা পাবে এখন। দুটো ছেলেই আমার সমান পাগল।"

ব্রজেন্দ্র বাবু একটী তাম্বুল লইয়া এবং গৃহিণী স্বামীর ভুক্তাবশেষ খাদ্য দ্রব্য লইয়া কক্ষ হইতে বাহির হইলেন।—

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রাজেন্দ্র ও শরৎ বৃক্ষের ছায়াতে বসিয়াছিলেন বলিয়া বজরার আরোহীরা তাঁহাদিগকে দেখিতে পান নাই, কিন্তু তাঁহারা জ্যোৎস্নালোকে সেই বজরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলেন। বজরা হইতে যে মুহূর্ত্তে বালকটি নদী বক্ষে নিক্ষিপ্ত হইল, শরৎ সেই মুহূর্ত্তেই জলে ঝম্প প্রদান করিলেন, এবং যথা সাধ্য দ্রুতবেগে, যে স্থানে বালকটি পড়িয়া গিয়াছিল, সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার বাহুতে যথেষ্ট বল ছিল, তিনি সন্তরণেও বিশেষ দক্ষ ছিলেন। কিন্তু গায়ে জামা ছিল বলিয়া তিনি ইচ্ছানুরূপ দ্রুতবেগে যাইতে পারিলেন না। বালকটি বজরার ছাদ হইতে পড়িয়া গেল, গায়িকা ভয়ে চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইল, যিনি হারমোনিয়ম বাজাইতে ছিলেন, তিনি এই আকস্মিক বিপদে যেন ক্ষণকালের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যেই আত্মসংবরণ করিয়া তিনি দণ্ডায়মান হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"যে খোকাকে

তুলিয়া আনিবে, তাকে হাজার টাকা দিব এখনই হাজার টাকা দিব।”

প্রভুর কথা শুনিয়া ৪।৫ জন দাঁড়ী ও ৩।৪ জন ভৃত্য তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিন্তু বজরা সেই অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটনা স্থল হইতে অনেক দূর প্রায় ৫০।৬০ গজ দূরে চলিয়া গিয়াছিল। দাঁড়ীরা ও ভৃত্যগণ ঘটনার সময় অন্য মনস্ক ভাবে বসিয়া গল্প করিতেছিল, সুতরাং তাহারা প্রথমে বালকের পতনের বিষয় জানিতেই পারে নাই। মাঝি তাহা দেখিয়া ছিল, কিন্তু পালে সহসা প্রবল বায়ু লাগাতে সে একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। হাল ছাড়িয়া জলে পড়িতে পারিল না। হাল ছাড়িয়া দিলে চাই কি বজরাও জল-মগ্ন হইত।

বজরার ছাদে সেই গায়িকা ব্যতীত আরও একটি স্ত্রীলোক ছিলেন, তিনি বজরার পশ্চাৎদিকে মুখ করিয়াছিলেন, বালকটী তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল, তাই তিনিও প্রথমে এই দুর্ঘটনার কথা জানিতে পারেন নাই। আরোহী ভদ্রলোক যখন বালককে উদ্ধার করিবার জন্য সকলকে আদেশ করিলেন তখন তিনি প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া “মাগো” বলিয়া চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

দেখিতে দেখিতে মাঝি বজরা কূলে লাগাইল। আরোহী ভদ্রলোক মূর্চ্ছিতাদিগের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া তাড়া-

তাড়ি কুলে লাফাইয়া পড়িলেন। এমন সময় মাঝি করযোড়ে বলিল,—

"হুজুর আপনি যাবেন না। মা ঠাক্‌রোণ মুচ্ছো গেছেন, দিদিমণি মুচ্ছো গেছেন, আপনি কাছে থাকুন। দাঁড়ীমাল্লা চাকর খানসামারা সবাই গেছে, এখনই খোকাবাবুকে নিয়ে আসবে, আপনি ভাববেন না। মা ঠাক্‌রোণের জ্ঞান হলে আপনি যদি কাছে না থাকেন, তবে তিনি হয়ত জলে ঝাঁপ দিবেন।"

ভদ্রলোকটি সবিনয় কথার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিলেন, কিন্তু পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় কাতর হইয়া বারংবার চিৎকার করিয়া সকলকে জল মধ্যে বালকের অনুসন্ধান করিতে বলিতে লাগিলেন।

যাহারা জলে নামিয়া ছিল, তাহারা ঠিক জানিত না যে বালকটি কোথায় পড়িয়া গিয়াছে। কাজে কাজেই তাহারা ইতস্ততঃ সাঁতার দিতে লাগিল। মাঝি তাহা দেখিয়া চিৎকার করিয়া বলিল,

"ঐ গাছতলায় ঐ দিকে যা—শীগ্‌গির শীগ্‌গির।"

দাঁড়ী ও ভৃত্যগণ দ্রুতবেগে সেই গাছের দিকে যাইতে লাগিল কিন্তু প্রতিকূল বায়ুতে তাহাদের সন্তরণে ব্যাঘাত হইতে লাগিল। তথাপি তাহারা প্রাণপণে অগ্রসর হইতে লাগিল।

শরৎ জলে ঝাঁপ দিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইতেই দেখিতে

পাইলেন, জলমগ্ন বালক হাবুডুবু খাইতে খাইতে একবার ভাসিয়া উঠিল ও পরক্ষণেই আবার জল মধ্যে অদৃশ্য হইল। রাজেন্দ্রও শরতের ঝম্পপ্রদানের অব্যবহিত পরে জলে নামিয়া ছিলেন, তিনিও জল মধ্যে বালকের অনুসন্ধান করিতে ছিলেন। বালককে মুহূর্ত্তের জন্য ভাসিয়া উঠিতে দেখিয়াই রাজেন্দ্র বলিলেন,

"শরৎ ঐ তোমার বাঁ দিকে হাতের কাছে—ধর—ধর।"

শরৎ বামদিকে সরিয়া গিয়া জল মধ্যে ডুব দিলেন। একটা কাপড় তাঁহার হাতে ঠেকিল, তিনি দৃঢ় মুষ্টিতে সেই কাপড় ধরিয়া ভাসিয়া উঠিলেন। ততক্ষণে রাজেন্দ্র তাহার নিকটে আসিয়া পড়িয়া ছিলেন। শরৎ বালকের জামার পশ্চাৎ ভাগ ধরিয়া ছিলেন, রাজেন্দ্র বালকের পশ্চাৎ দিক্ হইতে দুই বগল ধরিয়া চিৎসাঁতার দিয়া কূলের দিকে যাইতে লাগিলেন। শরৎও রাজেন্দ্রের পার্শ্বে থাকিয়া বালকের মস্তক জলের উপরে তুলিয়া ধরিয়া সাঁতার দিতে লাগিলেন এবং শীঘ্রই কূলে উপস্থিত হইলেন। দাঁড়ীমাল্লারা তখনও দূরে দূরে সাঁতার দিতে ছিল।

তীরে উঠিয়াই শরৎ দেখিলেন, বজরা কূলে লাগিয়াছে। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া রাজেন্দ্রের নিকট হইতে বালককে লইয়া বক্ষে স্থাপন পূর্ব্বক সেই বজরার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। রাজেন্দ্র চিৎকার করিয়া বলিলেন—

"ভয় নাই। পাওয়া গেছে তোমরা জল থেকে ওঠ। ছেলে পাওয়া গেছে—ভয় নাই।"

রাজেন্দ্রের কথা শুনিয়াই সেই ভদ্রলোক বজরা হইতে কূলে নামিয়া তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। শরৎ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র তিনি বালককে কোলে লইয়া বলিলেন, "বেঁচে আছে ত? জীবনের কোন আশঙ্কা নাই ত?"

শরৎ বলিলেন, "ভয় নাই—জলে অধিকক্ষণ ছিল না। ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে আপনার কোন চিন্তা নাই। আপনি বালককে লইয়া শীঘ্র বজরার ভিতরে যান।"

"আপনারাও আসুন—আমার স্ত্রী ও কন্যা মূর্চ্ছা গেছেন, আমি তাঁদের দেখি—আপনারা একবার ইহার কাছে থাকুন।"

এই বলিয়া তিনি বজরায় উঠিয়া বালককে বজরার ভিতরে এক স্থানে শয়ন করাইয়া ছাদে গেলেন, শরৎ ও রাজেন্দ্র বালকের মূর্চ্ছা অপনোদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

৯

শরৎ যথার্থই অনুমান করিয়াছিলেন, বালক অল্পক্ষণ জলের ভিতরে ছিল বলিয়া অতি সামান্য পরিমাণ জল তাহার উদরস্থ হইয়া ছিল। শরৎ বালকের জামা ও প্যান্ট খুলিয়া দিলেন, রাজেন্দ্র সেই কক্ষ হইতে একখানা শুষ্ক বস্ত্র লইয়া বালকের সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ষণ করিতে লাগিল। দুই তিন মিনিটের

মধ্যেই বালক নড়িয়া উঠিল, একবার চক্ষু চাহিয়া আবার মুদ্রিত করিল। তারপর হঠাৎ খানিকটা জল বমন করিয়া ফেলিল।

রাজেন্দ্র বলিলেন, "আর ভয় নাই। চেষ্টা করিয়া বমন করাইতে হইল না। এই যে নিঃশ্বাস পড়িতেছে।"

এমন সময় ছাদের উপরে রমণীর করুণ-কণ্ঠে "বাপরে কোথা তুই" বলিয়া একজন কাঁদিয়া উঠিলেন। রাজেন্দ্র ভিতর হইতে বলিলেন—

"ভয় নাই—অজ্ঞান হয়েছে, আপনারা কাতর হবেন না।" এই কথা শুনিবামাত্র সেই রমণী অস্থির চরণে দ্রুতবেগে নীচে নামিয়া আসিলেন, আরোহী ভদ্রলোক তাঁহার স্বামীও একটি কিশোরীর অচেতন দেহ ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিলেন। নামিবার সময় শরীর আন্দোলিত হওয়াতে সেই মূর্চ্ছিতা কিশোরীরও জ্ঞানের সঞ্চার হইল।

স্ত্রীলোকটি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই সেই বালককে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন এবং বারংবার তাহার মুখচুম্বন করিতে করিতে রাজেন্দ্র ও শরৎকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,

"বেঁচে আছে ত? ভাল হবে ত?"

শরৎ বলিলেন—

"মা, আপনি ভয় পাবেন না, নিশ্বাস পড়ছে, একবার চোখ চেয়েছিল—বমি হইয়া সমস্ত জল বাহির হইয়া গিয়াছে,

আর কোন ভয় নাই। একটা গরম কাপড় ইহার গায়ে ঢাকা দিয়ে রাখুন আর যদি পারেন তবে একটু গরম দুধ খাওয়াইয়া দিন।”

রাজেন্দ্র বলিলেন—

“যদি দুধ না থাকে, তবে আমার সঙ্গে একজন লোক দিন আমি বাড়ী থেকে দুধ পাঠাইয়া দিতেছি।”

ভদ্রলোকটী বলিলেন, “দুধ আছে—বোধ হয় গরম দুধই আছে একটু পূর্ব্বে আমরা চা খাইয়া ছিলাম—বেয়ারা, এক কাপ গরম দুধ দাও ত!”

বাহির হইতে একজন ভৃত্য বলিল, “যো হুকুম হুজুর।”

আরোহী ভদ্রলোক তখন রাজেন্দ্র ও শরতের সিক্তবস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—

“আমরা খোকাকে নিয়েই বিব্রত হয়ে রয়েছি। আপনাদের জামা কাপড় ভিজে গেছে সে দিকে আমাদের লক্ষ্য নাই। বেলা, দুখানা কাপড় এঁদের দাও—আমার জামা কি এঁদের গায়ে হবে? হয়ত দুটা জামাও এনে দাও—না হয় ত দুটা গেঞ্জি দাও।”

পিতার আদেশ শুনিয়া সেই কিশোরী বা বালিকা ধীরে ধীরে উঠিয়া পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিল। রাজেন্দ্র বলিলেন—

“আমাদের কাপড়ের জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না।

আমাদের বাড়ী নিকটেই, আমরা একেবারে বাড়ীতে গিয়েই কাপড় ছাড়িব।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন—

"তা কি হয়? বিলক্ষণ, কাপড় ছাড়ুন, চা খান, আপনাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করি। আজ আপনারা আমার একমাত্র পুত্রের প্রাণ রক্ষা করেছেন। ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অসম্ভব—অন্তর্যামিই জানেন আমি আজ আপনাদের নিকটে কি ঋণে বাঁধা পড়লেম।"

সেই স্ত্রীলোকটি বলিলেন—

"বাবা আজ তোমাদের কল্যাণেই আমার হারান মাণিক ফিরে পেলাম। তোমরা না থাক্‌লে যে কি সর্ব্বনাশই হত, তা ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। বাবা সনৎ এখন কেমন আছ?"

বালক ক্ষীণস্বরে বলিল, "ভাল আছি।"

এমন সময় বেলা দুইখানি বস্ত্র ও দুইটা গেঞ্জি আনিয়া রাজেন্দ্র ও শরতের সম্মুখে স্থাপন করিল। কর্ত্রী বলিলেন—

"যাও বাবা ভিজে কাপড় ছেড়ে শুকনো কাপড় পরে বসে কথাবার্ত্তা কও।"

অগত্যা রাজেন্দ্র ও শরৎ শুষ্ক বস্ত্র দুই খানা লইয়া কক্ষের বাহিরে গিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন। একজন ভৃত্য নদী জলে সিক্ত বস্ত্র দুইখানা ধৌত করিয়া নিংড়াইয়া এক পার্শ্বে রাখিয়া দিল। বেহারা সেই সময় খোকা ওরফে সনতের

জন্য গরম দুধ লইয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলে, কর্ত্রী বলিলেন, "তুই পেয়ালা চা নিয়ে আয়।"

রাজেন্দ্র ও শরৎ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বালককে একটা সুকোমল শয্যায় শয়ন করান হইয়াছে। তাহার জননী একটা চামচ করিয়া পুত্রের মুখে একটু একটু করিয়া দুধ দিতেছেন। তাঁহারা উপবেশন করিলে সনতের পিতা বলিলেন—

"এইবার আপনাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারি বোধ হয়—"

রাজেন্দ্র বলিলেন—

"আমার নাম রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এই গ্রামেই আমাদের বাস। ইনি আমার বন্ধু, ইহার নিবাস হুগলী জেলায়। আমরা দুইজনে কলিকাতায় এক মেসে থাকিয়া ল কলেজে অধ্যয়ন করি। সংপ্রতি কলেজ বন্ধ হইয়াছে বলিয়া ইহাকে আমাদের দেশ দেখাইবার জন্য আনিয়াছি। ইহার নাম শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।"

বয়স্ক ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করা রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া রাজেন্দ্র বা শরৎ সেই ভদ্রলোকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—

"আমার নাম শ্রীহরনাথ রায়। রাজকার্য্য উপলক্ষে কিছুদিন হইল খুলনায় আসিয়াছি। আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভাল নহে বলিয়া চিকিৎসকের পরামর্শে মধ্যে মধ্যে বজরা করিয়া

জলে জলে ভ্রমণ করি। বেলা আমার কন্যা আর সনৎ আমার পুত্র।

এইরূপে কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় বেহারা দুই কাপ চা লইয়া প্রবেশ করিল। গৃহিণী চায়ের পাত্র দুইটী লইয়া রাজেন্দ্র ও শরতের হস্তে দিয়া গাত্রোত্থান করিয়া কক্ষান্তরে গমন করিলেন এবং দুইখানা রেকাবীতে করিয়া কিছু মিষ্টান্ন আনিয়া উভয়ের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন,

"চা খেয়ে একটু মিষ্টি মুখ কর বাবা। তোমরা আর জন্মে নিশ্চয়ই আমার কে ছিলে, তা' নইলে আজ এই বিপদে সাহায্য করবার জন্য তোমরা আস্‌বে কেন? হাঁ বাবা তোমাদের বাড়ীতে কে আছেন?"

প্রশ্নটা উভয়কেই একযোগে জিজ্ঞাসা করা হইল। শরৎ বলিলেন, "রাজেন্দ্রের পিতামাতা ভাইভগিনী সকলেই আছেন, ইঁহার পিতা ব্রজেন্দ্র বাবু এই গ্রামের জমিদার। আমার এ ত্রিসংসারে এক জ্যেঠাই মা ছাড়া আর কেহ নাই। বাল্যকালে পিতামাতাকে হারাইয়া ছিলাম। এতদিন পরে রাজেন্দ্রের বাটীতে আসিয়া আবার মা পাইয়াছি—বাপ পাইয়াছি।"

গৃহিণী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—

"আহা বাপ মা নাই? তা বাবা রাজেন্দ্রের বাটীতে তুমি একটী মা পাইয়াছ আর আজ এই নদীতে আর একটি মা পাইলে। তুমি পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয়ই আমার ছেলে ছিলে।"

শরৎ বলিলেন—

"আমি মাতৃহীন হইলেও দেখিতেছি আমার মাতৃভাগ্য খুব ভাল। তা না হলে এই দূরদেশে আসিয়া একেবারে দুই মা পাইব কেন! আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনি আমাকে পুত্র বলে মনে করিয়াছেন।"

রাজেন্দ্র দেখিলেন এরূপ আলাপের শীঘ্র শেষ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাই তিনি হরনাথ বাবুর প্রতি চাহিয়া বলিলেন.

"আজ আমাদিগকে তবে বিদায় দিন। রাত্রি প্রায় নয়টা হইল, হয়ত বাবা এতক্ষণ আমাদের সন্ধানে লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

কর্ত্রী বলিলেন—

"আচ্ছা বাবা আজ তাহ'লে এস। আবার যেন দেখা পাই। তোমরা বিনামূল্যে আমাদিগকে কিনে রাখিলে।"

শরৎ ও রাজেন্দ্র উভয়ে কর্ত্তা ও গৃহিণীকে প্রণাম করিয়া—কেন না হরনাথ বাবুর সূক্ষ্ম জামার অন্তরালে উপবীত দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল—দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহারা বাহিরে আসিয়া সিক্ত বস্ত্র লইবার উদ্যোগ করিলে, রায় মহাশয় তাঁহাদের হাত হইতে বস্ত্র লইয়া বলিলেন—

"ভিজে কাপড় আপনাদিগকে লইয়া যাইতে হইবে না। আমি কাল পাঠাইয়া দিব।"

অগত্যা সিক্ত বস্ত্র রাখিয়া রাজেন্দ্র ও শরৎ বজরা হইতে

তীরে অবতরণ করিলেন। রায় মহাশয়ও তাঁহাদের সহিত কিছু দূর আসিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন কিন্তু তাঁহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আর বজরা হইতে নামিলেন না। গৃহিণী বাহিরে আসিয়া আবার বলিলেন—"বাবা আবার যেন দেখা পাই।"

রাজেন্দ্র ও শরৎ সম্মতি জানাইয়া গ্রাম অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

## ১০

রাত্রি নয়টার পর রাজেন্দ্র ও শরৎ বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, ব্রজেন্দ্র বাবু তাঁহাদিগকে, বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজেন্দ্র সংক্ষেপে কারণের উল্লেখ করিয়া শরৎকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কর্ত্তার কাছে বিলম্বের কারণ সংক্ষেপে বলিয়া নিস্তার, পাইলেও তাঁহারা রাজেন্দ্রের জননী কল্যানীর নিকটে বিস্তারিত বর্ণনা করিতে বাধ্য হইলেন। একটি শিশু জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল. এই কথা শুনিয়াই তাঁহার মাতৃহৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। শিশুর বয়স কত, তাহার ভগিনী কত বড়, দেখিতে কেমন, তাহার জনক জননী হারান ধন লাভ করিয়া কিরূপ আনন্দ প্রকাশ করিলেন, কি বলিয়া শরৎ ও রাজেন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, বজরাতে চা পানের সময় কি মিষ্টান্ন তাঁহারা খাইয়া ছিলেন প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জিজ্ঞাসা

করিতে লাগিলেন। রাজেন্দ্র ও শরৎ আহার করিতে করিতে মাতার ঐ সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন।

পরদিন পূর্ব্বাহ্ণ ও মধ্যাহ্ন কাটিয়া গেল, হরনাথ বাবুর নিকট হইতে কোন লোক, রাজেন্দ্র ও শরতের বস্ত্র লইয়া আসিল না, অথবা তাঁহারা বজরা হইতে যে বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাও লইতে আসিল না। তাঁহারা হরনাথ বাবুর পুত্রের কুশল বার্ত্তা জানিবার জন্য একটু উৎ-কণ্ঠিত হইয়া রহিলেন।

অপরাহ্ণ কালে ব্রজেন্দ্র বাবুর নিকটে রাজেন্দ্র ও শরৎ বসিয়া আছেন, এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে একজন ভদ্রলোক, রাজেন্দ্র বাবু ও শরৎ বাবুর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়াই সকলে বুঝিতে পারিলেন যে হরনাথ বাবু স্বয়ং আসিয়াছেন। ব্রজেন্দ্র বাবু ভৃত্যকে বলিলেন, "তাঁকে এইখানে নিয়ে এস।"

ক্ষণকাল পরে সেই ভৃত্যের সহিত হরনাথ বাবু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই তিন জনে আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। হরনাথ বাবু সকলকে নমস্কার দিলে তাঁহারাও প্রতিনমস্কার করিলেন। ব্রজেন্দ্রবাবু আগন্তুককে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে সকলেই উপবেশন করিলেন।

ব্রজেন্দ্রবাবু দেখিলেন আগন্তুক অতি সুপুরুষ, তাঁহার বয়স

বোধ হয় ৪৫ বৎসর হইবে। উন্নত ও বিস্তৃত ললাট এবং উজ্জ্বল চক্ষু, দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে তিনি অনন্য সাধারণ বুদ্ধিমান্। তাঁহার পরিধানে একখানা সাদা ধুতি, গায়ে একটা লংক্লথের পিরাণ, পায়ে সাদা ক্যাম্বিসের পাদুকা। একখানা রেশমি চাদর স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া বক্ষের উপরে ঝুলিতেছে। তাহার বেশ ভূষাতে কোনরূপ আড়ম্বর নাই। অঙ্গুলীতে একটা বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরী তাঁহার আর্থিক অবস্থার কথঞ্চিত পরিচয় দিতেছিল।

সকলে উপবেশন করিলে রাজেন্দ্র বলিলেন—

"বাবা ইনিই বাবু হরনাথ রায়। কাল ইঁহারই কথা আপনাকে বলিয়া ছিলাম।"

হরনাথ বাবু ব্রজেন্দ্র বাবুর দিকে চাহিয়া সহাস্তে বলিলেন—

"আপনি যে ব্রজেন্দ্র বাবু, রাজেন্দ্র বাবুর পিতা, তাহা আপনাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিয়াই অনুমান করিয়াছি। কাল আপনার পুত্র এবং শরৎ বাবু আমার যে কি উপকার করিয়াছেন, আমাদিগকে যে কি গভীর কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করা আমার ক্ষমতাতীত। ইহারা আমার একমাত্র পুত্রের জীবনদাতা, অধিক আর কি বলিব।"

ব্রজেন্দ্র বাবু বলিলেন—

"আমরা অপরের অপকার করিবার অনেক সুযোগ

পাই কিন্তু উপকার করিবার সুযোগ বড় অল্পই পাই। কাল রাজেন্দ্র ও শরৎ যে সেই সুবিধা পাইয়াছিল, ইহা তাহাদেরই সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিবেন।"

রাজেন্দ্র বলিলেন—

"কাল আপনার পুত্রকে রক্ষা করিয়াছে শরৎ। যখন বালকটি জলে পড়িয়া যায়, তখন আমরা সেই গাছতলায় বসিয়া আপনার কন্যার গান শুনিতেছিলাম। আপনার পুত্রকে জলে পতিত হইতে দেখিয়া আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম, কিন্তু শরৎ কালবিলম্ব না করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। উহাকে জলে ঝাঁপ দিতে দেখিয়া আমিও জলে নামিলাম। তারপর শরৎই তাহাকে জল হইতে উদ্ধার করে আমি তখন অনেকটা দূরে ছিলাম।"

হরনাথ বাবু এই কথা শুনিয়া শরতের সহিত একবার সেক্‌হ্যাণ্ড করিলেন।

ব্রজেন্দ্র বাবু বলিলেন—

"ভগবান্ যা করেন, তা আমাদের ভালর জন্যেই করেন। দেখুন, কাল আপনাদের সেই দুর্ঘটনার জন্য আজ আপনার সহিত আলাপ করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম।"

ব্রজেন্দ্র বাবু হাসিয়া বলিলেন,—

"কে জানে, হয়ত ভবিষ্যতে এই আলাপ পরিচয় আত্মীয়-তায় পরিণত হইতে পারে।" এই বলিয়াই তিনি একবার

শরতের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। রাজেন্দ্র বা শরৎ কেহ তাহা দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু সে কটাক্ষ ব্রজেন্দ্র বাবুর দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না।

হরনাথ বাবুর পরিচয় ব্রজেন্দ্র বাবু পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন, তিনি রাজেন্দ্র ও শরতের মুখে যতটুকু শুনিয়াছিলেন, তাহার অতিরিক্ত পরিচয় লইবার চেষ্টা আপাততঃ ভদ্রতা সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। সেইজন্য তিনি হরনাথ বাবুর বিষয় কর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

চারিজনে প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা হইল। ব্রজেন্দ্র বাবু লক্ষ্য করিলেন যে, হরনাথ বাবুর কণ্ঠস্বরে, দৃষ্টিতে, কথার ভঙ্গীতে, প্রত্যেক কার্য্যে অনন্যসুলভ একটা বিশেষত্ব প্রকাশ পাইতেছে। তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় অনেক কথা কহিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন না, অথচ সে সম্বন্ধে যে দুই চারিটি কথা বলিলেন, তাহাতেই তাঁহার অন্তরের কথা, তাঁহার হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইল।

রাজেন্দ্র বলিলেন—

"কাল সন্ধ্যার পর আপনার বজরাতে শুনিয়াছিলাম যে, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আপনারা চা পান করেন। বোধ হয় আপনার চা পান করিবার সময়ও হইয়াছে। যদি বলেন তাহা হইলে এক কাপ চা আনাইয়া দি।"

ব্রজেন্দ্রবাবু সহাস্যে বলিলেন—

"আপনাদের কোন অনুরোধই আমি অগ্রাহ্য করিতে পারি না। আপনাদের সন্তোষের জন্য আমি অসাধ্য সাধনও করিতে পারি, এক কাপ চা খাওয়া কি এতই কঠিন যে, এই অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া আপনার মনে কষ্ট দিব?" এই বলিয়াই হাসিয়া উঠিলেন।

রাজেন্দ্র আর কিছু না বলিয়া কক্ষ ত্যাগ করিলেন এবং, প্রায় পাঁচ মিনিট কাল পরে, পূর্ব্ব দিনের পরিহিত সেই দুই খানা বস্ত্র ও গেঞ্জি দুইটা লইয়া প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—

"অনুগ্রহ করে, তবে একবার পাশের ঘরে চলুন।" এই বলিয়া কাপড় ও গেঞ্জি টেবিলের উপরে রাখিয়া দিলেন।

রাজেন্দ্রনাথের হাতে কাপড় দেখিয়া হরনাথ বাবু বলিয়া উঠিলেন,—

"ঐ দেখুন, আপনাদের কাপড় দিতে এসে সেই কাপড়ের কথাই ভুলে গেছি।"

এই বলিয়া দণ্ডায়মান হইয়া ঈষৎ-উচ্চ কণ্ঠে ডাকিলেন, "চাপরাশি!" হরনাথ বাবু দণ্ডায়মান হইলে, ব্রজেন্দ্র বাবু প্রভৃতি আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। হরনাথ বাবুর আহ্বানে দ্বারের বাহির হইতে "হুজুর" বলিয়া উত্তর দিয়া এক উর্দ্দি-পরিহিত তকমা-পরা চাপরাসী রাজেন্দ্র ও শরতের পূর্ব্ব দিনের পরিহিত বস্ত্র ও জামা লইয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল।

ব্রজেন্দ্র বাবু, রাজেন্দ্র এবং শরৎ সবিস্ময়ে দেখিলেন সেই চাপরাশির চাপরাশে ইংরাজীতে লেখা রহিয়াছে—

"কালেক্টর এণ্ড ম্যাজিষ্ট্রেট খুলনা।"—

তাঁহাদের আর বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। সবিস্ময়ে হরনাথ বাবুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রজেন্দ্র বাবু করযোড়ে বলিলেন,—

"ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন। আপনিই যে আমাদের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রে, তাহা বুঝিতে পারি নাই। হয়ত সাধারণ ভদ্রলোক জ্ঞানে আপনার পদমর্য্যাদার অনুরূপ সংবর্দ্ধনা করিতে পারি নাই।" হরনাথ বাবু, ওরফে খুলনার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রে, আই, সি, এস, সহাস্যে বলিলেন—

"আপনি আমাকে অকারণে অপরাধী করিবেন না। আমি শ্রীহরনাথ রায়, আজ আমার পুত্রের প্রাণ-রক্ষাকারীদের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আসিয়াছি। খুল্‌নার ম্যাজিষ্ট্রেট আপনার বাটীতে সরকারি কার্য্যে আসেন নাই যে, আপনি অত কুণ্ঠিত হইতেছেন। আমিই বরং আমাকে আপনার সমকক্ষ বলে মনে কর্ত্তে কুণ্ঠিত হই। আমি পরের গোলাম আর আপনি স্বাধীন জমিদার।

একজন বিলাত ফেরৎ সিভিলিয়ান্ ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট যে এত সরল, এত উদার, এত অমায়িক হইতে পারেন, ব্রজেন্দ্র বাবুর তাহা কল্পনারও অতীত! ব্রজেন্দ্র বাবুর মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, মিঃ রে রাজেন্দ্রকে বলিলেন—

"চলুন কোথায় যেতে হবে।"

সকলে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, একটা মার্ব্বেল টেবিলের উপরে নানা প্রকার ফল মূল ও মিষ্টান্ন এবং এক কাপ চা রহিয়াছে। হরনাথ বাবু হাসিয়া বলিলেন,—

"এসব বুঝি চায়ের অনুপান? অনুপান মন্দ নহে ত!"

এই বলিয়া আর কোনরূপ দ্বিধা প্রকাশ না করিয়া সেই সকল ফল মূল ও মিষ্টান্নের সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেন। জল-যোগ শেষ করিয়া তিনি চা পান করিলেন এবং তাম্বূল পাত্র হইতে তাম্বূল লইয়া মুখে দিয়া বলিলেন,—

"পান আমি বড় একটা খাই না, দাঁতগুলার পেন্সনের সময় হয়ে এল, একটু সাবধান হওয়া ভাল।"

এই বলিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। ব্রজেন্দ্র বাবু দেখিলেন সেই হাসিতে যেন শিশুর সরলতা মাখান রহিয়াছে।

আরও পাঁচ সাত মিনিট কথাবার্ত্তার পর হরনাথ বাবু রাজেন্দ্র ও শরতের সহিত সেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া এবং ব্রজেন্দ্র বাবুকে নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

## ১১

রাজেন্দ্র ও শরৎ কলিকাতার বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। যোড়াগাছি হইতে আসিবার সময় রাজেন্দ্রের জননী শরতকে বারংবার বলিয়া দিয়াছিলেন,—

"বাবা, যেখানে থাকিস্ মাঝে মাঝে চিঠি দিস্। আর ছুটী পেলেই অন্ততঃ দুই এক দিনের জন্যও দেখা দিয়ে যাস। দেখিস ভুলিস্‌নে বাবা।"

শরৎ তাঁহার এই অনুরোধ যথারীতি পালন করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়া কলিকাতায় আসিলেনএবং প্রতিশ্রুতি পালনে কোনরূপ শৈথিল্য প্রকাশ করিলেন না। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই তাহাকে পত্র লিখিতেন। শ্রাবণমাসে একবার ২।৩ দিনের জন্য রাজেন্দ্রের সহিত যোড়াগাছিতে গিয়া মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন। পূজার বন্ধের সময়, বাটীতে পূজার গোলমাল মিটিয়া গেলে, আবার একবার কয়েকদিনের জন্য যোড়াগাছিতে আসিবেন বলিলেন।

বৈশাখমাসে শরৎ প্রথম যোড়াগাছিতে গিয়াছিলেন, সে সময়ে রাজেন্দ্রের জননী তাঁহাকে পুত্র বলিয়া কোলে তুলিয়া লইলেও, শরতের যেন কেমন্ একটা কুণ্ঠা ছিল, তিনি ঠিক ঘরের ছেলে হইতে পারেন নাই। রাজেন্দ্রের জননীর ইচ্ছা যে, শরৎও ঠিক তাঁহার রাজুরই মত অসঙ্কোচে বাটীর ভিতর আসিবেন, তাঁহার নিকট হইতে আব্দার করিয়া খাবার চাহিয়া খাইবেন। কিন্তু শরৎ একেবারে অতটা ঘরের ছেলে হইতে পারেন নাই। তিনি রাজেন্দ্রকে সঙ্গে না লইয়া বাটীর মধ্যে যাইতেন না। মা ডাকিয়া খাবার না দিলে, খাবার চাহিয়া খাইতেন না। অন্তঃপুরে রাজেন্দ্রের পত্নীর অস্তিত্বই শরতের সঙ্কোচের প্রধান কারণ।

শরৎ কলিকাতায় আসিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, যোড়াগাছিতে তিনি যেমন মা পাইয়াছেন—সেইরূপ কি যেন একটা হারাইয়াও আসিয়াছেন। কি হারাইয়াছেন তাহা প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। তিনি একদিন একাকী বসিয়া বসিয়া যোড়াগাছি গমনের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। পথের দৃশ্য, রাজেন্দ্রের বাটী, ব্রজেন্দ্র বাবুর অমায়িক সস্নেহ ভাব—মায়ের আদর যত্ন। মায়ের কথা মনে হইতেই তাঁহার নয়ন-পল্লব যেন একটু সিক্ত হইয়া উঠিল। তিনি এ জীবনে মাতৃ-স্থানীয়া অনেক ভদ্রমহিলাকে দেখিয়াছেন, কিন্তু যোড়াগাছিতে মাকে যেমনটি দেখিলেন, কই তেমন ত আর কাহাকেও দেখেন নাই। দর্শন-মাত্র মা যেমন ভাবে তাঁহাকে একেবারে কোলে তুলিয়া লইয়াছেন, তেমন ত আর কেহ লইতে পারেন নাই। তাঁহার গর্ভধারিণীকে মনে পড়িল, মনে হইল বুঝি সেই মা কায়া বদলাইয়া যোড়াগাছিতে তাঁহাকে আবার দেখা দিলেন। জননীর সহিত এই মায়ের আকৃতি-গত সাদৃশ্য না থাকিলেও জননীর হৃদয়ে যে স্নেহ নির্ঝর ছিল, সেই নির্ঝর যে যোড়াগাছির মায়ের হৃদয়েও প্রবাহিত। সেই মাই এই মা।

তাহার পর রাজেন্দ্রের পুত্রের অন্নপ্রাশনের কথা এবং তদুপলক্ষে সমারোহ, ভোজ, যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতির কথা মনে পড়িল। তারপর সেদিনকার সেই সন্ধ্যাকালের ঘটনা, হরনাথ বাবুর পুত্রের বিপদের কথা মনে পড়িল। যখন সেই

শিশুকে জল হইতে উদ্ধার করিয়া বজরার ভিতরে শয্যায় স্থাপিত করা হইল, তখন বেলার দৃষ্টিতে যে কাতরতা অথচ কৃতজ্ঞতা লক্ষিত হইয়াছিল, সেই কথা সহসা শরতের মনে হইল। তিনি, কেন জানি না, একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। সহসা তাঁহার বোধ হইল বুঝি তিনি সেই বজরা-তেই কিছু হারাইয়া আসিয়াছেন। কি হারাইয়াছেন ? মনে মনে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, কলিকাতা হইতে যখন তিনি যোড়াগাছিতে গমন করেন, তখন তাঁহার মন যেরূপ ছিল, তথা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় ত ঠিক তেমনটি ছিল না। মাতৃ-হীন শরৎ যোড়াগাছিতে মা পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু সেজন্যত হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইবার কথা, তবে সে পরিপূর্ণতার মধ্যে আবার একটা অভাবের ছায়াপাত হয় কেন ? তবে কি হরনাথ বাবুর কন্যা তাঁহার মন হরণ করিয়াছে ? অসম্ভব ! সম্ভবই হউক আর অসম্ভবই হউক, শরৎ হিসাব করিয়া দেখি-লেন যে, বেলার সেই সকাতর দৃষ্টি তাঁহার হৃদয়ের অনেকটা জুড়িয়া আছে। তিনি যতই অন্য কথা ভাবিবার চেষ্টা করেন ততই যেন হরনাথ বাবুর সেই বজরা তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিতে থাকে। এমন কি তিনি বেলার চিন্তা ছাড়িয়া মায়ের স্নেহ, মমতা, আদর যত্নের কথা ভাবিতে গিয়া দেখিলেন যে তাঁহার মনে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই বেলার কথাই যেন বারংবার আসিতে থাকে। অবশেষে তিনি প্রবীণ দার্শনিকের মত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, তিনি বেলাকে

দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছেন, তাঁহার চিত্তটি বেলা অধিকার করিয়াছে—অর্থাৎ এক কথায় তিনি বেলাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন।

যখন এটা স্থির হইল যে তিনি বেলাকে ভালবাসিয়াছেন, তখন ইহাও স্থির যে যেমন করিয়াই হউক বেলাকে লাভ করিবার চেষ্টা করিতেই হইবে।

সেদিন রাজেন্দ্র বাসাতে ছিলেন না, পিতার আদেশে কোন আত্মীয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। বাসাতে বলিয়া গিয়াছিলেন যে তিনি সেদিন রাত্রিতে বাসায় আহার করিবেন না। সুতরাং শরৎ সমস্ত সন্ধ্যাটা একাকী বসিয়া দুইটি সুন্দর উজ্জ্বল চক্ষু এবং সেই চক্ষুর অধিকারিণীকে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রাত্রি নয়টার সময় শরৎ আহার শেষ করিয়া আইনের পুস্তক খুলিয়া বসিলেন। আর তিন চারি মাস পরেই পরীক্ষা, সুতরাং পড়া শুনাতে অবহেলা করা হইবে না। পুস্তক খুলিয়া প্রায় একঘণ্টা বসিবার পর শরৎ দেখিলেন যে পুস্তকের একটি ছত্রও তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিবার অধিকার পায় নাই, সেই রাগে ছত্রগুলা বেলার আকৃতি ধারণ করিয়া তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অগত্যা তিনি পুস্তক বন্ধ করিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং অস্ফুট স্বরে একবার বলিলেন—"ও বাবা এরই নাম প্রেম? যাকে ইংরেজীতে love বলে?"

রাত্রি ১১টার পর রাজেন্দ্র বাসাতে ফিরিয়া দেখিলেন, শরৎ জাগিয়া পড়িয়া আছে, অথচ পরীক্ষার পড়া পড়ে নাই। রাজেন্দ্র বলিলেন—

"কিহে এখনও জেগে আছ যে ?"

"হাঁ ভাই ঘুম পায় নাই।"

"তবে পড়িলে না কেন ?"

"পড়িতে বসিয়াছিলাম, কিন্তু পড়া হইল না, ঘুমও আসিল না।"

"লক্ষণ ভাল নহে, যে শরৎ বাবু পরীক্ষার ছয় মাস পূর্ব্ব হইতে একেবারে মলাটের মত কেতাবকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকেন, এবং শয্যা গ্রহণমাত্র নিদ্রাদেবী যাঁহার চেতনা হরণ করেন—সেই শরৎ বাবু আজ পরীক্ষার সাড়ে তিন মাস পূর্ব্বে পড়িতে বসিলেন অথচ পড়া হইল না, শয্যাগত হইলেন অথচ নিদ্রাগত হইলেন না—এত ভাল লক্ষণ নহে। ইহাকে কিসের পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়া মনে করা উচিত ?"

রাজেন্দ্রের কথা শুনিয়া শরতের ভয় হইল, হয়ত তিনি শরতের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছেন। রাজেন্দ্র বিবাহিত যুবক—তিনি প্রেমের বাজারে একজন বড় মহাজন—আর শরৎ—অবিবাহিত—প্রেমের হাটে সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি, হয়ত এই মহাজনের কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছেন। তাই তিনি তাড়াতাড়ি অপ্রস্তুত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কিসের আবার লক্ষণ!" রাজেন্দ্র বলিলেন—

"কণ্ঠস্বরে যেন একটু অপ্রস্তুতের ভাব আছে—সুতরাং ইহা চিন্তার লক্ষণ।"

বস্তুতঃ রাজেন্দ্র তখন পর্য্যন্ত শরতের মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই—তিনি বন্ধুর সহিত সাধারণভাবে রহস্য করিতেছিলেন। কিন্তু শরৎ মনে করিলেন যে, রাজেন্দ্র যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃস্তলপর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছেন। শরৎ বলিয়া উঠিলেন—

"তোমার মত ত আমার ঘাড়ে ভূত চাপে নাই যে পরীক্ষার পূর্ব্বে প্রেমের কথা ভাবিব।"

রাজেন্দ্র উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন,—

"ঠাকুর ঘরে কে রে? না আমিত কলা খাই নাই। ঘাড়ে ভূত চাপে নাই, পেত্নী চেপেছে। এখন ভাল মানুষটির মত বলে ফেল দিখি কোথায়—কোন্ শ্যাওড়া গাছের তলায় কাদের পেত্নী তোমার ঘাড়ে চাপিল?" এই বলিয়াই গুণ্ গুণ্ করিয়া গান ধরিলেন,—

"কি হ'ল আমার বুঝিবা সজনি হৃদয় আমার হারিয়েছি।"

শরৎ বাধা দিয়া বলিলেন—

"যদি জ্যাঠাম কর তবে বলিব না।"

রাজেন্দ্র শরতের মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিলেন,—

"বলহে শরৎ বাবু—কে তোমায় করিল কাবু—উঁহু হল না, ছন্দপাত হয়ে গেল না? তবে, সখা প্রকাশ করে বল, আমি শ্রবণ করি।"

এই বলিয়া ধুপ করিয়া শরতের শয্যায় শয়ন করিয়া তাহাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন,—

"সে কাদের কুলের বউ, ওগো কাদের কুলের বউ ?
তুমি চুপি চুপি আমায় বল জানবে নাক কেউ।
ও সে কাদের কুলের বউ—"

তখন শরৎ দুষ্টামি আরম্ভ করিলেন, তিনিও সুর করিয়া বলিলেন—

"ওগো সে মুখুয্যেদের বউ—
ঘোড়াগাছিতে শ্বশুর বাড়ী, পরণে তার ঢাকাই শাড়ী—"

রাজেন্দ্র শরৎকে এক ধাক্কা দিয়া বলিলেন—

"—তবে যাও তুমি যমের বাড়ী।"

শরৎ উঠিয়া বসিয়া বলিলেন,—

"তবে প্রকাশ করে বলি শ্রবণ কর।"

১২

রাজেন্দ্র বলিলেন,—

"ঘরের ভিতরে বড় গরম, চল ছাতে যাই।"

এই বলিয়া তিনি একখানা সূতি কম্বল লইয়া ছাদের দিকে গমন করিলেন। শরৎ একটা বালিশ ও একখানা পাখা লইয়া তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন।

শুক্ল পক্ষের রজনী—মধ্য রাত্রিতে ত্রয়োদশীর চন্দ্র মধ্যাকাশে বসিয়া সুধা ছড়াইতেছিলেন। সেই জ্যোৎস্নালোকে

রাজেন্দ্র ও শরৎ ছাদের উপরে শয়ন করিলেন। তখন শরৎ প্রাণের বন্ধুর নিকটে প্রাণের কথা প্রকাশ করিলেন। সে কথা প্রকাশ করিতে তাঁহার হৃদয় কতবার কিরূপ স্পন্দিত হইল তাহা কে বলিবে?

রাজেন্দ্র ধীরভাবে সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—

"হুঁ, ভালও বটে—মন্দও বটে। ভাল অর্থাৎ পাত্রীটি পাত্রের সর্ব্বাংশেই যোগ্য—সুতরাং ভাল। আর মন্দ—পাত্রীটি জবরদস্ত সিভিলিয়ান—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কন্যা। মিঃ রের জামাতা একজন যে চোগা-চাপকান-ওয়ালা সামলা-মাথায় উকীল—মুন্‌সেফের এজলাসে দাঁড়াইয়া যোড়হাতে সাড়ে তিন-শত টাকা মাইনের হুজুরের কাছে—"ধর্ম্মাবতার" "ধর্ম্মাবতার" বলিবেন, ইহা একেবারেই ভাল নহে—সুতরাং মন্দ। সিভি-লিয়ানের কন্যার স্বামী—অর্থাৎ বাঙ্গালায় যাকে জামাই বলে—সে হয় সিভিলিয়ান না হয় সিভিল সার্জ্জেন—অন্ততঃ এক জন ব্যারিষ্টার হওয়া চাই। তা না হলে বড়ই বেমানান হয়; সুতরাং তোমার জয় লাভের কোন আশা নাই।"

শরৎ বলিলেন—

"কেন, উকীল হলেই বুঝি মুন্‌সেফের কোর্টে গিয়ে "ধর্ম্মাবতার" ধর্ম্মাবতার" বলিতে হইবে? হাইকোর্টেও কত উকীল আছেন, যাঁরা আসল ব্যারিষ্টার অপেক্ষাও কেতা দুরস্ত —কে বলিবে তাঁরা বাঙ্গালী!"

"তা হউক, তারা ঝুটা। মিঃ রে অমন ঝুটাকে যে

কন্যা দান করিবেন তাহাত মনে হয় না। তিনি খাঁটি জিনিষ চান।"

"তিনিও ত সে দিন খাঁটি বাঙ্গালী বাবু হইয়াই আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। আমরাও তাঁহাকে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিয়া কিছুই বুঝিতে পারি নাই।"

"তিনি সাচ্চা বলিয়াই সাচ্চা বাঙ্গালী রূপে গিয়াছিলেন। যদি ঝুটা হইতেন, তাহা হইলে সেই ঝুটা রূপেই যাইতেন। তাঁর কাছে ঝুটার আদর হইবে না। যদি তিনি বিলেত ফেরৎ না হইতেন, তবে তোমার পক্ষে আশার কথা ছিল। কিন্তু তিনি যে তাঁহার কন্যার জন্য বিলাত ফেরৎ জামাতাই খুঁজিবেন।"

"তোমার কি দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি বিলাত ফেরৎ ব্যতীত অন্য কাহাকেও কন্যাদান করিবেন না?"

"দৃঢ় বিশ্বাস নহে—অনুমান মাত্র, কিন্তু অব্যর্থ অনুমান। সে দিন বজরাতে তাঁহাদের আচার ব্যবহার কথা বার্ত্তা দেখিয়াও কি বুঝিতে পার নাই যে, তিনি বাঙ্গালী হইলেও তোমার আমার মত বাঙ্গালী নহেন—খাঁটী সাহেব, অথচ পুরাদস্তুর সাহেব হইলেও খাঁটী বাঙ্গালী। ঘুম পাচ্ছে চল শুইগে।"

এ বিষয় লইয়া আর কথা কাটাকাটি করা শরৎও তখন সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। উভয়ে শয্যা তুলিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ইহার পর উভয় বন্ধুতে একটু নির্জ্জনে কথা বার্ত্তা

কহিবার সুযোগ পাইলেই মিঃ রের কথা, বেলার কথার আলোচনা হইত। রাজেন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, বিলাত ফেরতের জামাতৃপদ লাভের যোগ্যতা, বিলাত ফেরৎ ব্যতীত আর কাহারও হইতে পারে না। তিনি বন্ধুর হৃদয়েও যুক্তি তর্ক ও দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই ধারণাই বদ্ধমূল করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, শরতের বিলাত যাইবার মত আর্থিক সামর্থ্য থাকিলেও উপায় নাই,—কারণ তাঁহার বড় মা শ্বশুরকুলের জল গণ্ডুষের একমাত্র আশার স্থল, শরৎকে কিছুতেই বিলাতে গিয়া জাতি খোয়াইতে দিবেন না। বড় মা আপত্তি করিলে শরৎ সে আপত্তি কিছুতেই খণ্ডন করিতে পারিবেন না। ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-ধারিণী বালবিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা হাসিমুখে নিজের প্রাণ ত্যাগ করিতে পারিবেন, তথাপি প্রাণের পুত্তলি শরৎকে বিলাতে পাঠাইতে পারিবেন না। সুতরাং শরতের ভাগ্যে যে বেলাকে পত্নীরূপে লাভ এক প্রকার অসম্ভব, তাহাতে রাজেন্দ্রের কণা মাত্র সন্দেহ ছিল না। সেই জন্য শরৎ যাহাতে বামন হইয়া চন্দ্র লাভ করিবার জন্য উদ্বাহু না হয়েন, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি শরৎকে বলিলেন,—

"ভাই,—ওসব বেলা টেলার আশা ছাড়িয়া দাও,—আমরা যেমন গৃহস্থ আমাদের মত সেইরূপ একটা টগর কি করবী, না হয় গন্ধরাজের চেষ্টা কর। নবেম্বর মাসে পরী-

কাটাও হইয়া যাক, তার পর দেশ বিদেশে ঘটক পাঠাই-বার জন্য মাকে গিয়া বলিব। ওসব কবির কল্পনা,—প্রেমিকের খেয়াল,—সেই চোখ দুটি,—সেই হাসিটুকু,—সেই,—সেই ঠোঁট দুখানি ওসব নাটক নভেলেই পড়িতে ভাল। যা বয় সয় তারই ব্যবস্থা কর।” শরৎ বন্ধুর একপ উপদেশে হাঁ কি না কিছুই বলিতেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে বন্ধুর পরামর্শই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিতেন, এবং মনে মনে কল্পনা করিতেন, এক ধনবান্ জমিদারের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইতেছে, কত বরযাত্রী কত কন্যাযাত্রী তাঁহাদের মধ্যে রাজেন্দ্র যেন বরকর্ত্তা সাজিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পুরোহিত মন্ত্র পড়াইয়া তাঁহার হাতের উপরে একখানি পদ্ম ফুলের মত সুন্দর হাত স্থাপন করিয়া ফুলের মালার দ্বারায় বাঁধিয়া দিলেন, অন্তঃপুরে স্ত্রী-আচার হইতেছে, চারি দিকে বেণারসী শাড়ীর ঘস ঘস্ শব্দ মুক্তাবগুন্ঠিতা, অর্দ্ধাবগুন্ঠিতা, ও অবগুন্ঠিতা শত শত রূপসী তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছেন। কাঠের পিঁড়ায় বসাইয়া কন্যাকে সেই ছাদ্‌লা তলায় আনয়ন করা হইল,—নাপিত উচ্চস্বরে ছড়া কাটাইতে লাগিল। শঙ্খ ও উলুধ্বনিতে অন্তঃপুর মুখরিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে,—এমন সময় শুভদৃষ্টির সময় হইল। বারংবার অনুরুদ্ধ হইয়া পাত্রী অতিকষ্টে মাথা তুলিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, তিনিও কম্পিত হৃদয়ে পাত্রীর মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, হরি হরি,—

এ যে বেলা! তিনি যতই পাত্রীর মুখ অন্যরূপ কল্পনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ততই যেন বেলা সেই কল্পিত মূর্ত্তিকে সরাইয়া দিয়া স্বয়ং তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। শরৎ বুঝিলেন যে, তাঁহার মন, প্রাণ, হৃদয়—অন্তর বাহ্য সমস্তই বেলাময় হইয়া গিয়াছে। বেলাকে বিস্মৃত হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

১৩

"বড় মা!"

"বাবা!"

"একটা কথা বল্‌ব রাখ্‌বে?"

"কি কথা বাবা?"

"যদি রাখ তবে বলি, যদি না রাখ তবে বলব না।"

"এমন পাগলও ত কোথাও দেখিনি। কি কথা তা বলবি না। আর আমি আগে থেকে সত্যি করে বসে থাকব? কি কথা শুনি।"

পরীক্ষা দিয়া শরৎ বাটীতে আসিয়াছেন। আর কয়েক দিন বাদেই বাটীতে দুর্গোৎসব হইবে,—তাই তিনি বাটীতে আসিয়াই নানা প্রকার কাজে কর্ম্মে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

নির্ব্বিঘ্নে দুর্গোৎসব শেষ হইল। যে সকল আত্মীয়-

স্বজন নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহাদের বাটীতে আসিয়াছিলেন, তাহারা ক্রমে ক্রমে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। শরতের সেই পৈতৃক আবাস আবার জনশূন্য হইল। সদর বাটীতে দুই চারি জন ভৃত্য ও একজন সরকার; অন্তঃপুরে দুই জন পরিচারিকা এবং বড়মা আর উদ্যানে কয়েক জন মালী,—এবং সর্ব্বত্র শরৎ স্বয়ং। এই কয়েক জন শরতের বাটীর অধিবাসী।

দুর্গোৎসবের পর উৎসবের গোলমাল মিটিয়া গেলে শরৎ ঘোড়াগাছিতে যাইবেন, এইরূপ কথা ছিল। তিনি পূজার পূর্ব্বে শরতের জননীকে যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহাতেই এই কথাই লিখিয়াছিলেন। শ্রাবণ মাসে যখন দুই তিন দিনের জন্য তথায় গিয়াছিলেন, তখনও কোজাগর লক্ষ্মী পূজার পর আবার মায়ের কাছে আসিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্যবিধাতা তাঁহাকে অন্য পথে টানিয়া লইয়া গেলেন।

লক্ষ্মী পূজার পর দিন রাত্রি কালে আহারাদির পর শরৎ বড়মার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে ছিলেন। কথার সূত্রপাত এই অধ্যায়ের প্রথমেই বিবৃত হইয়াছে। বড়মা যখন বলিলেন,—"কি কথা শুনি?" তখন শরৎ মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা না করিয়া অতি সহজ ভাবে সহজ স্বরে একেবারে বলিয়া ফেলিলেন,—

"আমি বিলেত যাব, আমাকে অনুমতি দিতে হবে।"

কথাটা শুনিয়া বড়মা প্রথম বিশ্বাস করিতেই পারিলেন

না যে, শরৎ সত্য সত্যই বিলাত যাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের ছেলে যার বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব হয়; সে যে এমন 'অনাচ্ছিষ্টি' আব্দার করিতে পারে,—এ ধারণাই বড়মার হয় নাই। তিনি উহা শরতের একটা কৌতুক মনে করিয়া বলিলেন,—

"তা যাস যাবি, এখনত ঘুমুগে যা।"

"তুমি বুঝি মনে করেছ আমি মিছে কথা বল্‌ছি? সত্যি সত্যিই আমি বিলেত যাব। তুমি বল্লেও যাব, না বল্লেও যাব। তবে তুমি যদি অনুমতি দাও হাসিমুখে তোমার পায়ের ধুল নিয়ে যাব। আর যদি অনুমতি না দাও তবে একদিন তুমি ঘুমুবে, সেই সময় লুকিয়ে তোমার পায়ের ধুল নিয়ে চলে যাব। তুমি জানতেও পার্বে না, আমারও মনে আনন্দ হবে না। কোনটা ভাল?"

শরতের কথা শুনিয়া বড়মা আকাশ হইতে পড়িলেন। যদি সহসা তাঁহার সম্মুখে বজ্রাঘাত হইত, তাহা হইলে তিনি যত না চমকিত হইতেন, দেবর পুত্রের কথা শুনিয়া তিনি ততোধিক বিস্মিত হইলেন। শরতের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে শরৎ প্রকৃত কথাই বলিতেছেন। তিনি বিলাতে যাইতে কৃত সঙ্কল্প; কাহারও আপত্তি মানিবেন না। তাই তিনি বলিলেন,—

"তুই কি পাগল হয়েছিস্? হিন্দুর ছেলে, ব্রাহ্মণের ছেলে বিলেত যাবি কি বল? ওকথা মুখে আন্‌তে নাই।"

"এত দিন ত মুখে আনিনি, মনেই ছিল, কিন্তু এখন মনের কথা মুখে না আনলে আর চলে না দেখেই মুখেই এনেছি। বল তুমি আমাকে যেতে দিবে ?"

"কি বলে তার ঠিক নাই। তুই বিলেতে যাবি, অখাদ্য খাবি, খৃষ্টেন হবি, মেম বিয়ে কর্‌বি আর আমি তোকে এই সব কাজে অনুমতি দেব ?"

"আমি ত ওসব কাজের জন্য অনুমতি চাচ্ছি না। আমি শুধু বছর খানেকের জন্য বিলাতে যেতে অনুমতি চাচ্ছি। কে বল্লে তোমাকে বিলেতে গেলে অখাদ্য খেতে হয়, মেম বিয়ে কর্ত্তে হয়, খৃষ্টান হ'তে হয় ?"

"হয় না ত কি ?"

"যে ইচ্ছা ক'রে করে তাকে ওসব ক'র্ত্তে হয়। আমি কেন কর্ব্ব ? আমি তোমার পায়ে হাত দিয়ে দিব্বি কচ্চি, মেম বিয়েও কর্ব্বনা আর খৃষ্টানও হব না। বছর খানেক বেড়িয়ে এসে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মত নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করব, যেমন আমাকে দেখ্‌ছ ঠিক্ এমনি ফিরে আসব। বল আমায় যেতে দিবে, তা নইলে আমি ছাড়ব না।"

এই বলিয়া বড়মার পদদ্বয় দৃঢ়রূপে ধরিয়া শরৎ সেইখানে শুইয়া পড়িলেন। বড়মা "ষাট" "ষাট" বলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া তুলিয়া বসাইলেন এবং সরোদনে বলিলেন,—

"হ্যাঁরে, এই সব কথা শুনিবার জন্যই আমি তোকে মানুষ করেছিলেম ? তোর মা ভাগ্যবতী স্বর্গে চলে গেল,

আর আমাকে এই সকল কথা শুনতে হবে বলে আমি বেঁচে রইলেম?" এই বলিয়া চক্ষে অঞ্চল চাপা দিলেন।

এইরূপে যে কান্না কাট্‌না মান অভিমান হইবে, তাহা শরৎ জানিতেন, সুতরাং তিনি তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তিনি সেদিন আর অধিক বাড়াবাড়ি করা যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। তিনি বড় মাকে বলিলেন,—

"তুমি আগে থেকেই কান্‌তে সুরু কল্লে কেন? আমিত আর এখনই যাচ্ছি না। আমি যা বল্লুম ভেবে দেখ, দেখে আমাকে অনুমতি দিয়ো। তবে একটা কথা বলে রাখি, আমার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলেছ—'তা যাস্ যাবি।' আমাকে ছুঁয়ে বলেছ তা মনে রেখো।"

এই বলিয়া শরৎ শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বড়মা চিত্রার্পিতের ন্যায় সেই স্থানেই বসিয়া রহিলেন।

## ১৪

ইহার পর কয়েক দিন ধরিয়া শরৎ ও তাঁহার বড়মার মধ্যে মান অভিমান, কান্না কাট্‌নার পালা চলিতে লাগিল। শরৎ কিছুতেই বড় মাকে বুঝাইয়া তাঁহার সম্মতি আদায় করিতে পারিলেন না, আবার বড়মাও কিছুতেই শরতকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিলেন না। শরতের জেদ, যেমন করিয়া পারেন বড়মার সম্মতি লইয়া বিলাতে যাইবেন,

কিন্তু বড়মা পাগলের এই পাগলামির সমর্থন করিবেন কোন্ প্রাণে? শরৎ যে তাঁহার শ্বশুর কুলের একমাত্র জল পিণ্ডদাতা। সেই শরৎ বিলাতে গিয়া খৃষ্টান হইবে, মেম বিবাহ করিবে, আর তাহার হাতের জল-পিণ্ড পিতৃ-পুরুষে গ্রহণ করিবেন? অসম্ভব!

শরৎ বারংবার বড়মাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, বিলাতে গেলেই লোকে খৃষ্টান হয় না বা মেম বিবাহ করে না। যে পৈতৃক ধর্ম্ম ত্যাগ করে অথবা হিন্দু হইয়া খৃষ্টানের মেয়েকে বিবাহ করে, সে মানুষ নহে পশু। শরৎ লেখা পড়া শিখিয়া কখনই এমন কুকার্য্য করিতে পারিবেন না।

যখন বড়মা দেখিলেন যে পাগল ছেলে কিছুতেই জেদ ছাড়িতেছে না, যখন কোন মতেই তাহাকে বুঝাইয়া বিলাত গমনের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারিলেন না, তখন তিনি নিজের মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদিন রাত্রিকালে এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সহসা তাঁহার মনে হইল যে তাঁহার মামাত ভগিনীর এক দেবরও বিলাতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিত খৃষ্টানও হয়েন নাই বা মেমও বিবাহ করেন নাই। তিনি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া একটি ব্রাহ্মণের মেয়েকেই বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাটীতে ষোল আনা হিন্দু-আণী বজায় আছে। বড়মা শুনিয়াছেন যে তাহার সেই ভগিনীর দেবরের বাটীতে মুসলমান বাবুর্চ্চি নাই,

ব্রাহ্মণ পাচক আছে। তা শরৎ যদি বিলাত হইতে আসিয়া সেইরূপে হিন্দু-য়ানী বজায় রাখিয়া চলে, তবে গেলেই বা বিলাতে, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি কি? কিন্তু তাহাকে ফিরিয়া আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে, প্রায়শ্চিত্ত না করিলে তাহার হাতের জল শুদ্ধ হইবে না, তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ অপবিত্র হাতের জল-গণ্ডুষ গ্রহণ করিবেন না।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বড়মার মনের ভাব ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। দুই জনের অভিমত যদি সম্পূর্ণ বিপরীত হয়, তবে তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব রক্ষা করিতে হইলে, হয় উভয়কেই কিছু কিছু, অথবা একজনকে সম্পূর্ণরূপে আপনার অভিমতের পরিবর্ত্তন করিতে হয়। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। শরৎ স্বীয় সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না দেখিয়া বড়মাই আপনার অভিমতের পরিবর্ত্তন করিলেন।

শরৎ যে দিন বড়মার নিকটে বিলাত গমনের প্রস্তাব করেন, তাহার ৪।৫ দিন পরে একদিন মধ্যাহ্নকালে তিনি আহার করিতেছিলেন, বড়মা পরিবেশন শেষ করিয়া হাত ধুইয়া তাহার নিকটে উপবেশন করিলেন। সেদিন বড়মার মুখের ভাব দেখিয়া শরৎ মনে করিলেন যে বোধ হয় তাঁহার মন একটু নরম হইয়াছে। তাই তিনি বলিলেন,—

"আচ্ছা বড়মা, আগে তুমি আমাকে দুই দিন না দেখ্‌তে পেলে একেবারে চক্ষে অন্ধকার দেখিতে কিন্তু, এখন

আমি কলিকাতায় থাকি, পরীক্ষার পূর্ব্বে ৪।৫ মাস ধরিয়া বাড়ীতে আসি না, তুমি আমাকে দেখ্‌তে পাও না, তোমার মন কেমন করে ?"

"মন কেমন করে কিনা তা ইষ্টদেবই জানেন। কতদিনে তোর চাঁদমুখখানি দেখ্‌ব, দিন রাত্তির কেবল তাই ভাবি। তবে জানি যে তুই পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত আছিস্‌, আসিবার অবকাশ পাস্‌ না, কাজেই চুপ করিয়া থাকি। ৮।১০ দিন অন্তর তোর চিঠি ত পাই।"

"আচ্ছা মনে কর আমি ৪।৫ মাসের বদলে যদি এক বছর কি দেড় বছর না আসতে পারি—অবশ্য পড়া-শুনার জন্য—আর প্রতি সপ্তাহে তোমাকে চিঠি দি, তা'হলে তুমি কি কর ?"

"কি আর করব ? জানি তোর পড়া শেষ হলেই আবার আসবি, আর প্রতি হপ্তায় তোর কুশল সংবাদ পাব, কাজে কাজেই মনকে বুঝিয়ে সুস্থির করে রাখব।"

"তবে আমাকে বিলাতে যেতে দিতেই বা তোমার আপত্তি কেন ? আমিত বলেছি যে এক বছর কি দেড় বছরের বেশী সেখানে থাকব না, আর প্রতি সপ্তাহে আমার চিঠি পাবে।"

"আমার আপত্তি—তুই সেখানে গিয়ে মোছলমানের রান্না ভাত খাবি, মদ খাবি আর মেম বিয়ে করে খৃষ্টান হবি, তাই আপত্তি করি।"

"আচ্ছা আমি যদি তোমাকে ছুঁয়ে দিব্যি করি যে ওসব কিছুই করবো না, তা'হলে ত তোমার আপত্তি হবে না?"

"ফিরে এসে কিন্তু প্রাচিত্তির কর্ত্তে হবে।"

শরৎ বুঝিলেন যে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার আর বিলম্ব নাই। তাই তিনি পরম উৎসাহে বলিলেন,—

"নিশ্চয়ই। প্রায়শ্চিত্ত না করলে তুমি আমাকে ছোঁবে না, তাকি আমি জানিনা?"

বড়মা অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—

"যদি বাছা তুই একান্তই যেতে চাস্ তা'হলে এখন কারও কাছে কিছু বলিস্‌নি। পাড়ার লোকে শুন্‌লে এখন থেকে একটা গোলযোগ পাকিয়ে ঘোঁট করবে। ফিরে এসে প্রাচিত্তির কল্লে বোধ হয় আর কোন কথা বল্‌বে না। আর পাড়াতে আছেই বা কে? তবে পাঁচজন আত্মীয় কুটুম? তা কে কার খোঁজ লয়?"

শরতের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, বড়মার সম্মতি পাইলেন। তিনি বড়মার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে বিলেতে মোছল্‌মানের রান্না ভাত খাইবেন না, মেম বিয়ে করিবেন না, খৃষ্টান হইবেন না এবং দেশে ফিরিয়া আসিয়া যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। ষ্টীমারে মুসলমানের স্পৃষ্ট খাদ্য গ্রহণ ব্যতীত উপায় নাই তাহা শরৎ জানিতেন, কিন্তু বড়মা ত ষ্টীমারের কথা কিছু বলেন নাই। বিলাতে মুসলমানের স্পৃষ্ট অন্ন

গ্রহণে নিষেধ করিলেন, শরৎও অম্লানবদনে সে নিষেধ শিরোধার্য্য করিলেন।

বড়মার সম্মতি লইয়াই শরৎ বাঁকিপুরে পিতার বন্ধু হরদৎ লালকে পত্র লিখিয়া আপনার বিলাত গমনের কথা জানাইলেন। তিনি যে বড়মার সম্মতি অনুসারেই যাইবেন, একথাও লিখিলেন। তিনি জানিতেন যে বাবু হরদৎ লাল ইহাতে আপত্তি করিবেন না। তাই তিনি পাথেয় পরিচ্ছদ ও হাত খরচ প্রভৃতির জন্য কিছু টাকা অগ্রে পাঠাইবার জন্য সেই হিতৈষী অভিভাবককে অনুরোধ করিলেন, এবং বিলাতে টাকা পাঠাইবার ঠিকানা পরে জানাইবেন, একথাও বলিলেন। আপাততঃ কত টাকার প্রয়োজন তাহারও একটা আনুমানিক হিসাব দিলেন।

১৫

দুর্গোৎসব শেষ হইল, কোজাগর লক্ষ্মী পূজা হইয়া গেল, শ্যামাপূজাও আসিয়া পড়িল, কিন্তু যোড়াগাছিতে শরতের আর যাইবার সময় হইল না। রাজেন্দ্র প্রত্যহ মনে করেন হয়ত আজ শরৎ আসিবেন নতুবা শরৎ কোন্ তারিখে আসিবেন তাহা নির্দ্দেশ করিয়া পত্র দিবেন, কিন্তু তাঁহার আশা ফলবতী হইল না। শরতের পত্র প্রায়ই পাইতেন, কিন্তু তাহাতে কোন্‌দিন তিনি যোড়াগাছিতে যাইবেন তাহার কোন উল্লেখ থাকিত না। "বিষয় কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে

যাইতে পারিতেছি না।” এই কথাই শরৎ প্রায় সকল পত্রে লিখিতেন।

কল্যাণীও সর্ব্বদাই শরতের পত্র পাইতেন, তাহাতেও ঐরূপ বিষয় কর্ম্মের কথা, কোন্‌দিন যে যোড়াগাছিতে যাইবেন তাহার কোন উচ্চবাচ্চই থাকিত না। অধিকন্তু “কুপুত্র যদি বা হয় কুমাতা কখনও নয়” এইরূপ ভাবের কথা মধ্যে মধ্যে থাকিত। মা মনে করিতেন—“আমার অমন ছেলে যদি কুপুত্র হয় তবে সুপুত্র কাকে বলে তা জানি না। আহা বাছার মুখখানি আবার কতদিন পরে দেখিব।”

রাজেন্দ্র তিন চারি দিন অন্তর শরতের নিকট হইতে পত্র পাইতেন,—কি জানি কেন, শ্যামা পূজার আট দিন পূর্ব্বে হইতে তিনি বন্ধুর আর কোন পত্রই পাইলেন না। তিনি শরৎকে এই আট দিনের মধ্যে তিন খানা পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার জননীও দুই খানা পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু কোন পত্রেরই উত্তর আসিল না দেখিয়া সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইলেন।

শ্যামা পূজাও হইয়া গেল। ব্রজেন্দ্র বাবু মনে করিয়াছিলেন যে শ্যামা পূজার সময় শরৎ নিশ্চয়ই আসিবেন, কিন্তু তাঁহার সে অনুমান ব্যর্থ হইল। শরতের দেখা নাই।

প্রতিপদের দিন প্রাতঃকালে ডাক পিয়ণ জমিদার বাবুর বাটীতে কয়েকখানা পত্র দিয়া গেল। তন্মধ্যে একখানি রাজেন্দ্রের নামে, একখানি “মাতা ঠাকুরাণী শ্রীচরণ কমলেষু”।

রাজেন্দ্র পত্র দুই খানি লইয়া মাতৃসন্নিধানে গমন করিলেন এবং জননীকে বলিলেন, "মা শরতের চিঠি এসেছে। সে আমাকে এক খানা পত্র দিয়াছে—আর তোমাকেও এক খানা পত্র দিয়েছে।"

জননী পুত্রকেই শরতের পত্র পাঠ করিতে আদেশ করিলেন। রাজেন্দ্র জননীর নামে লিখিত পত্র পাঠ করিলেন :—

"সংখ্যাতীত প্রণাম পূর্ব্বক শ্রীচরণে নিবেদন,

মা, আজ তোমার অবাধ্য ছেলে একটা দুঃসাহসিক কাজ করিতে বসিয়াছে, আশীর্ব্বাদ কর যেন সে সফল মনোরথ হইয়া আবার তোমার চরণে হাসিমুখে যাইতে পারে। মা, আমি বিলাতে যাইতেছি। আজ বোম্বাই হইতে তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি, আজই আমাদের জাহাজ ছাড়িবে—ইহার পর যেখানে সুবিধা পাইব, সেখান হইতেই পত্র লিখিব। মা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমি কুপুত্র হইলেও তুমি যেন কুমাতা হইও না। না, তুমি কখনও কুমাতা হইতে পার না, কারণ তুমি যে আমার মা, আমি যে তোমার ছেলে।

ইচ্ছা ছিল তোমাদিগকে প্রণাম করিয়া তোমাদের আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া আমি বিলাতে যাইব। কিন্তু বড় লজ্জা করিতে লাগিল, তাই আর তোমাদিগকে এ মুখ দেখাইতে পারিলাম না। এই অপরাধের জন্য তোমার এই পাগল ছেলেকে কি ক্ষমা করিবে না?

আমি জানি যে আমার এই পত্র পাইয়া তোমার মনে

বড় কষ্ট হইবে, কিন্তু মা, ছেলেপিলের জন্য মা বাপের মনে অনেক সময় কষ্ট হয়, কিন্তু সে জন্য মা বাপ কি ছেলেকে ক্ষমা করেন না ?

মা, আর অধিক লিখিবার সময় নাই। যদি ষ্টীমারে বসিয়া লিখিতে পারি তবে এই বার তোমাকে খুব বড় এক খানা পত্র দিব। আমি কেন বিলাত যাইতেছি—সে কথা হয়ত রাজেন্দ্র তোমাকে বলিবে। শুনিলে তুমি আমাকে পাগল বলিবে। আমি সত্য সত্যই পাগল—তা না হলে এমন পাগলামি করিব কেন ?

যাহা হউক, মা আমাকে হাসিমুখে বিদায় দাও। অনেক কষ্টে বড়মার সম্মতি পেয়েছি। তিনি সম্মতি দিয়েছেন, আমার বিশ্বাস তুমিও আমাকে ক্ষমা কর্ব্বে। তুমি আমার লক্ষ লক্ষ প্রণাম জানিও। ইতি—

তোমার পাগল ছেলে।"

শরৎ রাজেন্দ্রকে যে পত্র লিখিয়া ছিলেন, তাহা আরও সংক্ষিপ্ত। জননীর আদেশে রাজেন্দ্র সে পত্রও পাঠ করিলেন :—

"ভাই রাজেন্দ্র,

আমি বিলাত যাইতেছি। আজ বোম্বায়ে আসিয়া পহুঁছিয়াছি। আজই ষ্টীমার ছাড়িবে।

কেন যাইতেছি তাহা তোমাকে লেখা বাহুল্য। ব্যারিষ্টার হইব মনে করিয়াছি। কেন, তাহা তোমার অবিদিত নাই।

বড়মা অনেক কষ্টে সম্মতি দিয়াছেন। মাকেও আজ পত্র দিলাম, জানি তিনি মনে বড় কষ্ট পাইবেন, আমার উপরে তাঁহার রাগ হইবে। কিন্তু ভাই উপায় নাই। যদি আমার কামনা, আশা পূর্ণ না হয় তাহা হইলে হয় ত আমি পাগল হইয়া যাইব।

তুমি বলিতে পার যে তোমাকে পূর্ব্বে আমার সঙ্কল্পের কথা জানাইলাম না কেন? ইহার উত্তর—আমার অপরাধ হইয়াছে। তুমি কাছে থাকিলে নিশ্চয়ই তোমাকে বলিতাম। কিন্তু পত্রে লিখিতে সাহস হইল না পাছে কোন রূপে মা জানিতে পারিয়া আপত্তি করেন। তাই এমন সময় তোমা-দিগকে জানাইলাম যে যখন আর আপত্তি চলিবে না। তোমরা যেদিন আমার পত্র পাইবে, সে দিন সম্ভবতঃ আমি আরব সাগরের এডেনের অর্দ্ধেক পথে।

যাহা হউক ভাই আমার এই খেয়ালের জন্য ক্ষমা করিও। মাকে ও বাবাকে আমার অসংখ্য প্রণাম জানাইয়া তাঁহা-দিগকে বলিও যেন তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করেন। আজ সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম। এই সমুদ্র পার হইয়া বেলা-ভূমিতে পৌঁছিতে পারিব কি? ভগবান জানেন। লণ্ডনে পঁহু-ছিয়াই আমার ঠিকানা জানাইব। ইতি—

তোমার শরৎ।"

মাতা পুত্র উভয়েই শরতের পত্র পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন। শরৎ একদিন কলিকাতার বাসাতে কথায় কথায়

বলিয়াছিলেন, বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিলেও কি বেলাকে পাইবার আশা করিতে পারিব না! রাজেন্দ্র সে কথা বিশেষ মূল্যবান বলিয়া মনে করেন নাই। আজ শরতের পত্র পাইয়া বুঝিলেন যে একদিন তিনি যাহা রহস্য মনে করিয়াছিলেন, তাহাই শরতের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। শরৎ সত্য সত্যই ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যাত্রা করিলেন।

শরতের পত্র শ্রবণ করিয়া রাজেন্দ্রের জননী একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন এ কথা বলাই বাহুল্য। তিনি রাজেন্দ্রের নামে লিখিত পত্র শ্রবণ করিয়া পুত্রকে বলিলেন—

"শরৎ বিলেত গেল কেন?"

তখন রাজেন্দ্র প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া আনুপূর্ব্বিক সকল কথা জননীর গোচর করিলেন। বলিতে বলিতে অনেক সময় তাঁহার বাধিয়া যাইতে লাগিল—কিন্তু তিনি কোন বিষয় গোপন করিলেন না। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রায়ের কন্যাকে লাভ করিবার আশাতেই যে শরৎ বিলাতে যাইতেছেন; বিলাত ফেরৎ না হইলে হয়ত বেলাকে লাভ করিতে পারিবেন না, এই সকল বিষয় লইয়া মাতাপুত্রে কিয়ৎক্ষণ আলোচনা হইল। জননী বলিলেন,

"সে পাগল ত বিলেতে গেল, এদিকে যদি বেলার কোথাও সম্বন্ধ স্থির হয়ে থাকে অথবা শরৎ আসবার পূর্ব্বেই যদি তার অন্য কোথাও বিবাহ হয় তাহা হইলে কি হইবে!"

শরৎ অথবা রাজেন্দ্র এই কথাটা, একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই। তাই জননীর কথা শুনিয়া রাজেন্দ্র একটু ভীত হইয়া বলিলেন,

"তাত সত্য কথা, শরৎ ত সে কথা একবারও ভাবে নাই। হয়ত তার একুল ওকুল দুই কুলই নষ্ট হবে। হাঁ মা কি হবে?" জননী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,

"কি আর হবে। যা প্রজাপতির মনে আছে তাই হবে। একবার কর্ত্তাকে বল্‌ব যদি রায় সাহেবের সঙ্গে দেখা করে তাঁর কানে এই কথা তুল্লে কোন কিছু কিনারা হয়। এ ছাড়া আর ত কোন উপায় দেখছিনে।".

রাজেন্দ্র বলিলেন,

"মেয়েটির বয়স ১৩-১৪ বছর বলিয়া বোধ হইল। বিলাত ফেরতের ঘরে অত ছোট মেয়ের বিবাহ কি বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয় না। ১৭-১৮ বছরেই তাদের মেয়েদের বিবাহ হয়। তত দিনে শরৎ ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরে আসবে। যা হক সে যেমন আমাকে লুকিয়ে এত বড় কাজটা কল্লে তখন আমিও সহজে ছাড়্‌বনা, আমি মায় সুদ—এর শোধ নিব?"

জননী সত্রস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তুই আবার কি করবি? তুই লুকিয়ে বিলেতে যাবি নাকি?"

রাজেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,

"আমিত আর সে বাঁদরের মত ক্ষেপিনি।"

১৬

পর দিন ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া। দুর্গোৎসব উপলক্ষে যে দীর্ঘ অবকাশ হয়, তাহা অনেক আফিসে ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে শেষ হইয়া থাকে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পর দিন দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত, কলেক্টরী প্রভৃতি খোলা হয়, সুতরাং রাজ কর্ম্মচারীরা অবকাশ উপলক্ষে কর্ম্ম স্থলে না থাকিলেও প্রায়ই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন কর্ম্মস্থলে সমাগত হইয়া থাকেন। ব্রজেন্দ্র বাবু গৃহিণীর নিকট হইতে শরতের বিলাত গমনের কথা এবং উদ্দেশ্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে আর কাল বিলম্ব না করিয়া একবার হরনাথ বাবুর সহিত দেখা করা উচিত। শরতের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে কি না; যদি থাকে তাহা হইলে, শরতের সম্বন্ধে কি করা উচিত সে বিষয়েও হরনাথ বাবু সৎপরামর্শ দিতে পারেন। এইরূপ আলোচনা করিয়া ব্রজেন্দ্র বাবু ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন, মধ্যাহ্ন কালে আহারাদির পর খুলনায় গমন করিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাঙ্গালা সকলেরই সুপরিচিত। বিশেষতঃ পল্লী-গ্রামের জমিদারগণের নিকটে। মিঃ ..., খুলনাতে অতি অল্প দিন হইল আসিয়াছেন, সেই জন্য তাঁহার সহিত ব্রজেন্দ্র বাবুর আলাপ পরিচয়ের সুযোগ হয় নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের নিকটে তাঁহাকে সর্ব্বদাই আসিতে হইত।

ব্রজেন্দ্রবাবু ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, যে চাপরাশী মিঃ রের সহিত তাঁহার বাটীতে গিয়াছিল, সে দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছে। চাপরাসী তিনকড়ি হাজরা ব্রজেন্দ্র বাবুকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল এবং প্রণাম করিয়া বলিল, "আসুন, হুজুর বাটীতেই আছেন।"

ব্রজেন্দ্র বাবু তাহার সহিত উদ্যান পার হইয়া কুঠীর নিকটে গমন করিলেন এবং আপনার নামের কার্ড তিন কড়ির হাত দিয়া মিঃ রের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন।"

দুই তিন মিনিটের মধ্যেই মিঃ রে, ওরফে হরনাথ বাবু কেননা তখন তিনি ধুতি পরিয়াছিলেন—সহাস্য বদনে বাহিরে আসিয়া আগন্তুককে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন,—

"আসুন আসুন, আস্তে আজ্ঞা হউক!"—আপনি যে হঠাৎ আজ এখানে আসিবেন, তাহা আমি আশা করি নাই।"

এই বলিয়া ব্রজেন্দ্র বাবুকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় পাঠাগারে প্রবেশ করিলেন এবং উভয়ে দুই খানি আসনে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ শারীরিক ও পারিবারিক কুশল বার্ত্তার পর মিঃ রে, জিজ্ঞাসা করিলেন "শরৎ বাবু এখন কোথায়?"

ব্রজেন্দ্র বাবু মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—

"শরতের সম্বন্ধে একটা কথা বলিবার জন্যই আমি আপনার নিকটে আসিয়াছি, কিন্তু কথাটা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি।"

মিঃ রে, বলিলেন,—

"আপনি অকুণ্ঠিত চিত্তে সকল কথা বলুন। শরৎ বাবু ও রাজেন্দ্র বাবু আমার যে কি উপকার করিয়াছেন, তাহা আপনার অবিদিত নাই। আপনি বিনা সঙ্কোচে আপনার বক্তব্য বলিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন।"

ব্রজেন্দ্র বাবু ঐ কথা শুনিয়া পকেট হইতে দুইখানি পত্র বাহির করিয়া মিঃ রের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন—

"ইহাতেই সমস্ত কথা আছে।"

শরৎ বোম্বাই হইতে রাজেন্দ্রকে ও তাঁহার জননীকে যে পত্র দিয়াছিলেন ইহা সেই পত্র। মিঃ রে পত্র লইয়া পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন, ব্রজেন্দ্র বাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি দেখিলেন যে পত্র পাঠ করিতে করিতে প্রথমে মিঃ রের মুখখানা গম্ভীর হইল, তাহার পর আবার সে গাম্ভীর্য্য তিরোহিত হইল।

পত্র দুইখানি পাঠ করিয়া পূর্ব্বের মত ভাঁজ করিয়া মিঃ রে ব্রজেন্দ্র বাবুর হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন,—

"সেদিন শরতের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, তাঁহার পিতা-মাতা নাই, সংসারে এক জ্যেঠাইমা আছেন। শরতের সংসারিক অবস্থা কিরূপ?"

ব্রজেন্দ্র বাবু লক্ষ্য করিলেন যে মিঃ রে এবারে আর শরৎ বাবু বলিলেন না, স্বধু "শরৎ" বলিয়া উল্লেখ করিলেন।

তিনি বলিলেন "আমি বিশেষ কিছু জানি না। তবে রাজেন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি যে, অবস্থা মন্দ নহে, আমাদেরই মত গৃহস্থ। সে দিন আমার পৌত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে প্রায় পাঁচ শত টাকা মূল্যের এক ছড়া হার সে যৌতুক করিয়াছিল, তাই মনে হয় যে, সে নিতান্ত দরিদ্র নহে।"

মিঃ রে বলিলেন—

"সম্ভব। ধনবান্ না হইলে কে বন্ধু-পুত্রকে পাঁচ শত টাকা মূল্যের অলঙ্কার যৌতুক দিতে পারে?"

ইহার পর শরতের স্বভাব চরিত্র ও বাসস্থান সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া বলিলেন—

"হুগলি জেলায় গোপালপুর? আমার বড়ভাজ ঠাকুরাণীর মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহার পিসতুত ভগিনীর হুগলি জেলায় গোপালপুরে চক্রবর্ত্তী মহাশয়দের বাটীতে বিবাহ হইয়াছে, আমার বড়ভাজের ভগিনী-পতির ভাই বসন্ত চক্রবর্ত্তী পশ্চিমে কোথায় ওকালতি করিতেন। তিনি অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন, কিন্তু অল্প বয়সেই তিনি মারা পড়িয়াছেন।"

ব্রজেন্দ্র বাবু বলিলেন—

"সেই বসন্ত বাবুই শরতের পিতা। আমি শরতের মুখে শুনিয়াছি যে, তাহার পিতার নাম ৺বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী, তিনি বাঁকিপুরে ওকালতি করিতেন। এখনও বাঁকিপুরে শরতের ৪।৫ খানি বাড়ী, কিছু ভূসম্পত্তি আছে।"

ব্রজেন্দ্র বাবুর কথা শুনিয়া মিঃ রে কিছু উচ্চকণ্ঠে "বেলা" "বেলা" বলিয়া কন্যাকে আহ্বান করিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষ হইতে "যাই বাবা" বলিয়া উত্তর দিয়া একটী অনিন্দ্যসুন্দরী কিশোরী সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে—ব্রজেন্দ্র বাবুর মনে হইল যেন একটি অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত পলনিরো গোলাপ বালিকারূপে তথায় আবির্ভূত হইল।

বেলা কক্ষমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পিতার নিকটে একজন অপরিচিত প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখিয়া ঈষৎ সঙ্কোচে পিতার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান হইল। মিঃ রে কন্যার মুখের প্রতি চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন—

"তোমার মাকে একবার সঙ্গে করে এইখানে নিয়ে এস দেখি, একটা বিশেষ কাজ আছে।"

বেলা প্রস্থান করিলে ব্রজেন্দ্র বাবু বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। মিঃ রে তাঁহার পত্নীকে সহসা এই এক অপরিচিত ভদ্রলোকের নিকটে আসিবার জন্য সংবাদ পাঠাইলেন কেন? তাঁহার বিস্ময় অন্তর্হিত হইবার পূর্ব্বেই মিসেস রে কন্যার হাত ধরিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং আগন্তুককে বেশ শান্তভাবে একটি নমস্কার করিয়া স্বামীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সম্ভবতঃ তিনি বেলার মুখে আগন্তুকের আগমন সংবাদ শুনিয়া ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, মিঃ রে বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু বা আত্মীয় ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত তাঁহার আলাপ করাইয়া দিতেন

না। মিসেস রে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র ব্রজেন্দ্রবাবু দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে প্রতি নমস্কার করিলেন।

মিঃ রে পত্নীকে বলিলেন—

"আমার মুখের দিকে কি দেখছ? বেয়াই মহাশয় আজ আমাদের বাটীতে পায়ের ধূলি দিয়েছেন তাঁর অভ্যর্থনা, সংবর্দ্ধনা কর। যা বেলা, তোর শ্বশুর মহাশয়কে প্রণাম কর।"

মিঃ রের কথা শুনিয়া মিসেস রে এবং ব্রজেন্দ্র বাবু বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। বেলা পিতার আদেশে লজ্জাবনত শিরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া ব্রজেন্দ্র বাবুকে প্রণাম করিল। পত্নী ও ব্রজেন্দ্র বাবুর অবস্থা দেখিয়া মিঃ রে একবার উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, তার পরে বলিলেন—

"বুঝতে পাল্লে না? ইনি রাজেন্দ্র বাবুর পিতা ঘোড়াগাছির জমিদার ব্রজেন্দ্র বাবু, শরতের ধর্ম্মপিতা! শরৎ—সেই, যিনি খোকাকে জল থেকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তিনি ইঁহার স্ত্রীকে "মা" বলেন। বেয়াই মহাশয় শরতের সঙ্গে বেলার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। শরৎ একটি আস্ত পাগল! আমি বিলাত ফেরৎ, পাছে বিলাত ফেরৎ ছাড়া অন্য কাহাকেও কন্যাদান কর্ত্তে সম্মত না হই, তাই ভেবে ব্যারিষ্টারি পড়বার জন্য আজ কয়দিন হ'ল ইংলণ্ড যাত্রা করেছেন। এখন সব বুঝলে? তুমি সেদিন বলছিলে, 'ঈশ্বর যদি শরতের মত একটি

জামাই যুটিয়ে দেন তবেই তোমার সকল বাসনা পূর্ণ হয়।' এই দেখ হাতে হাতে ঈশ্বর তোমার বাসনা পূর্ণ করেছেন। শরৎ আবার কে জান? বড় বৌ ঠাকুরোণের সেই যে এক পিসতুত ভগিনীর গোপালপুরে চক্রবর্তীদের বাড়ী বিবাহ হয়েছিল বলিয়া শুনেছ, সেই ভগিনীর দেবর বসন্ত বাবু শরতের পিতা। শরৎ সত্য সত্যই আমাদের ঘরের ছেলে। সেদিন বেয়াই মহাশয় আমাকে চা ও মিষ্টান্ন খাইয়ে বিদায় করে ছিলেন! কিন্তু আমার ত সে সাহস হয় না, তুমি দুট মিষ্ট কথা বলে কুটুম্ব সৎকার কর।"

স্বামীর কথা শুনিয়া মিসেস রের সুন্দর বদন আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই ব্রজেন্দ্র বাবু বলিলেন—

"যখন আপনার এই সরস্বতী প্রতিমার মত কন্যাকে আমি ঘরের বৌ কর্ত্তে পারি, তখন আপনার বাটীতে চা খেলেই কি আমার জাত যাবে? শুভ কর্ম্মে মিষ্টমুখ করাই নিয়ম·সে নিয়ম ভঙ্গ করবার আমার কোন অধিকার নাই। কিন্তু এখন ক্ষমা করুন—অপরাহ্ণ কালে বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে জলযোগ করে যাব।"

তার পর শরতের সম্বন্ধে, রাজেন্দ্রের সম্বন্ধে, আরও অনেক বিষয়ের আলাপ হইল। কথায় কথায় মিঃ রে বলিলেন—

"বেলার বয়স এই ১৪ বৎসর, ১৭ বৎসরের পূর্ব্বে তাহার

বিবাহ সম্বন্ধে কোন কথা বার্ত্তা কহিব না এইরূপ আমার ইচ্ছা ছিল। শরতের ফিরিয়া আসিতেও দুই তিন বৎসর লাগিবে। এখনত কথা বার্ত্তা স্থির হয়ে রইল, তার পর সে আসিলেই বিবাহ হইবে। এর মধ্যে এক দিন বেলাকে নিয়ে গিয়ে তোমার বেয়ানের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে এস না। আমিও মনে করছি অবকাশ মত এক সময় রাজেন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে গোপাল পুরে গিয়ে শরতের জেঠাইমার সঙ্গে দেখা করে আসি, কি বল ?”

এই বলিয়া তিনি পত্নীর মুখের প্রতি চাহিলেন। মিসেস রে সহাস্যে সম্মতি প্রকাশ করিলেন.

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ভাবী বৈবাহিকের বাটিতে জলযোগ করিয়া ব্রজেন্দ্র বাবু হৃষ্ট চিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

## ১৭

ইহার পর কয়েক মাস কাটিয়া গেল। শরৎ লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া রাজেন্দ্রকে যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেই বড়মারও একখানি পত্র ছিল। শরৎ রাজেন্দ্রের সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন যে, তিনি তাঁহার বড়মার পত্র রাজেন্দ্রের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন, রাজেন্দ্র সেই পত্র একখানা পৃথক্ খামে পুরিয়া বড়মার নামে গোপালপুরে পাঠাইবেন এবং বড়মা শরতকে যে পত্র লিখিবেন বা লিখাইবেন তাহাও রাজেন্দ্রের নিকটে যাইবে, রাজেন্দ্র সেই পত্র লণ্ডনে শরতের

কাছে পাঠাইয়া দিবেন। এইরূপ বন্দোবস্ত হওয়াতে গোপালপুরের কোন লোকই শরতের বিলাত যাত্রার কথা জানিতে পারিল না।

শরতের বিলাত যাত্রার প্রায় ছয় মাস পরে একদিন মিঃ রে বজরাযোগে পত্নী, কন্যা এবং পুত্রকে লইয়া ব্রজেন্দ্র বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ব্রজেন্দ্র বাবু অতি সমাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। ব্রজেন্দ্র বাবুর পত্নীও মিসেস রে বেলা ও "খোকা" অর্থাৎ মিঃ রের পুত্র শ্রীমান্ সনৎ-কুমারকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া নানা প্রকারে তাহাদের আদর আপ্যায়ন করিতে লাগিলেন। বেলার রূপ দেখিয়া ব্রজেন্দ্র বাবুর পত্নী অত্যন্ত পুলকিত হইলেন,—শরতের উপযুক্ত বউ হবে! রাজেন্দ্রের স্ত্রী বেলাকে আপনার কক্ষে ডাকিয়া লইয়া গিয়া তাহার সহিত নানা প্রকার গল্প জুড়িয়া দিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে শরৎঠাকুরপোর কথা তুলিয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেও ছাড়িলেন না। রাজেন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর বিনয়ও অতি শীঘ্র সনৎকুমারকে আয়ত্ত করিয়া ফেলিল এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাগানে খরগোস, গিনি-পিগ ও হরিণ শিশু দেখাইতে গেল।

মিঃ রে প্রাতঃকালে বেলা নয়টার সময় ব্রজেন্দ্র বাবুর বাটীতে গিয়াছিলেন, তাঁহার ইচ্ছা ছিল তথায় এক ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টাকাল থাকিয়া বজরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আহারাদি করিবেন। কিন্তু, তাহা হইল না। তাঁহার ভাবী

বেয়ান ঠাকুরাণী কিছুতেই তাঁহাদিগকে অভুক্ত অবস্থায় ছাড়িয়া দিলেন না। মিসেস রে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন;—

"হাঁ বেয়ান, মেয়ের বাড়ীতে ভাত খেতে আছে ? আগে আমার নাতি হ'ক তারপর এসে ভাত খাব।"

ব্রজেন্দ্র বাবুর স্ত্রী উত্তরে বলিলেন,—

"এখনও ত আমার শরতের সঙ্গে বেলার বিয়ে হয় নাই, তা এখন খেলে কোন দোষ হবে না। ওদের চার হাত এক হ'লে না হয় খাবেন না।" সমস্ত দিন যোড়াগাছিতে কাটাইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে মিঃ রে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি রাজেন্দ্রকে বলিলেন,—

"আগামী গুড ফ্রাইডের ছুটীর সময় আপনার সঙ্গে গোপালপুরে যাবার ইচ্ছা আছে, আপনার কোন অসুবিধা হবে না ত ?"

রাজেন্দ্র বলিলেন,—

"আমার আবার অসুবিধা কি ? বিশেষতঃ শরতের বিলাত যাইবার পর হইতে আমাদের মধ্যে মধ্যে সেখানে যাইতেই হয়। তা আপনি যেদিন যাইবেন আমাকে সংবাদ দিলে তার পূর্ব্বেই আমি খুলনাতে আপনার কাছে যাইব।"

বৈশাখ মাসের প্রথমেই গুড ফ্রাইডের অবকাশ উপলক্ষে মিঃ রে রাজেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তথায় একদিন বিশ্রাম করিয়া পরদিন প্রাতের গাড়ীতে গোপালপুরে গমন করিলেন।

বেলা প্রায় ১০টা, বড়মা স্নানান্তে আহ্নিক শেষ করিয়া বাহিরে আসিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময় রাজেন্দ্রের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। রাজেন্দ্র অন্তঃপুরেই প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, "বড়মা।"

"কে রে রাজু এসেছিস? আয় বাবা আয়। আমিও মনে করেছিলেম, অনেকদিন আসিস্ নাই। বাড়ীর সব খবর ভাল? খোকা ভাল—ওমা।"

বড়মা কথা কহিতে কহিতে বাহিরে আসিয়াই দেখিলেন রাজেন্দ্রের পার্শ্বে একজন প্রৌঢ়াভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বড়মা লজ্জিত হইয়া মাথায় কাপড় টানিয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে মুখ আচ্ছাদন করিলেন।

মিঃ রে—বলা বাহুল্য যে রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে মিঃ রে ওরফে হরনাথ বাবু আসিয়াছিলেন—বড় মাকে দেখিয়াই পাদুকা উন্মোচন করিয়া বড়মার নিকটে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন—

"দিদি, আমাকে আপনি চিন্তে পারছেন না। তা কখনও ত দেখেন নাই কিরূপেই বা চিনিবেন। আমার নাম শ্রীহরনাথ রায়, আপনার মামাত বোন আমার বড় ভাজ ঠাক্‌রোন। এখন আমাকে বোধ হয় চিন্তে পার্ব্বেন। আজ রাজেন্দ্র বাবুর সঙ্গে আপনার এখানে চারিটি প্রসাদ পাব বলে এসেছি।"

হরনাথ বাবুর পরিচয় পাইয়া বড়মা সহাস্যে অবগুণ্ঠনের পরিসর একটু কমাইয়া দিয়া বলিলেন—

"এস ভাই এস! আমি বলি কে আবার রাজুর সঙ্গে এল। তা তুমিত আমার আপনার লোক। দিদি এখন কোথায় আছেন?"

"বউ ঠাকুরোণ বাটিতেই থাকেন, আমার চাকরি—সর্ব্বদা বিদেশে থাকতে হয়, তিনি বাড়ীতে থেকে বাড়ীতে সন্ধ্যা দেন আর পৈতৃক ক্রিয়া কলাপ যাতে বজায় থাকে তাই করেন।"

"বেশ, বেশ; আহা দিদিকে কতকাল দেখিনি, দিদি আমার চেয়ে প্রায় ২।৩ বছরের বড়। যখন মামার বাড়া যেতাম, দিদির সঙ্গ ছাড়া এক দণ্ডও থাকৃতেম না। রাত্তিরে দিদির কাছে না শুলে ঘুম হত না। সেই দিদির সঙ্গে বোধ হয় আজ বিশ পঁচিশ বছর দেখা হয় নাই। তা তোমার বউ কোথায়! ছেলে পিলে কি?"

হরনাথ বলিলেন—

"বউ খুলনাতে আছে। আমি সেইখানে চাকরি করি। আমার একটি মেয়ে একটি ছেলে।"

"মেয়েটি বুঝি বড়? বয়স কত হ'ল, তার বিয়ে হয়েছে?"

"বয়স এই ১৩ পার হয়ে ১৪তে পোড়েছে। বিয়ে এখনও হয় নাই।"

রাজেন্দ্র বলিলেন—

"বড়মা শরৎ এঁরই মেয়ে বেলাকে বিয়ে করবে বলে লেখা পড়া শিখতে বিলাতে গেছে। ইঁনি শরতের সঙ্গে

বেলার বিবাহ দিবার ইচ্ছা করে আপনার সম্মতি নিতে এসেছেন।”

“ওমা, তার আবার সম্মতি কি? এত আপনা-আপনির ভিতরে জানা ঘর, এতে আর সম্মতির কি আছে। বিশেষতঃ ছেলে যখন ওঁর মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য ক্ষেপেছে।”

এই বলিয়া হরনাথকে বলিলেন—

“তা তুমিও বিলেত গেছলে না? আমি মনে করেছিলেম হিঁদুর ছেলে বিলেত গেলে বুঝি সাহেব হয়ে যায়। কিন্তু তুমিত তা হওনি, তুমিত দিব্বি আমাদেরই মতন আছ?”

হরনাথ সহাস্যে বলিলেন—

“দিদি আমিত আপনাদেরি। তা' আপনাদের মত থাকবো নাত আবার কাদের মত হব? আমি কি বাঙ্গালা কথা ভুলে গেছি, না গুরুজনকে প্রণাম কর্ত্তে ভুলে গেছি? তবে আপনার পায়ের ধূল নিতে সাহস হয়নি, পাছে আপনাকে আবার স্নান কর্ত্তে হয়।”

বড়মা হাসিয়া বলিলেন—

“পাগলের কথা শোন! তুমি আমাকে ছুয়ে পায়ের ধূল নিলে আমাকে নইতে হবে কেন? দিদি আমাকে লিখে ছিলেন যে তুমি বিলেত থেকে এসে প্রাচিত্তির করে জাতে উঠেছ।”

“তা না হ'লে কি সাহস করে আপনার কাছে আসতে পারি?”

বড়মা অভ্যাগতদের জন্য আহারের ব্যবস্থা করিতে যাইলেন। হরনাথ বাবু রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে সদর পুকুরে স্নান করিতে গেলেন। তিনি সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিয়া গামছা লইয়া পুষ্করিণীতে অবগাহন-পূর্ব্বক স্নান করিলেন এবং স্নানান্তে জলে দাঁড়াইয়াই জপ করিলেন।

বিলাত ফেরৎ মিঃ রেকে হাতে উপবীত জড়াইয়া জপ করিতে দেখিয়া রাজেন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি বিস্ময় দমন করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আপনিও জপ করেন?"

"কেন করিব না? সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাতে গিয়া দুই তিন বৎসর ছিলাম বলে কি পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার ব্যবহার বিসর্জ্জন দিতে হইবে? সাহেবেরা ত এদেশে দীর্ঘকাল বাস করিলেও আপনাদের আচার ব্যবহার, পোষাক বা ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়ে না। তারা প্রতি রবিবারে গির্জ্জায় যায়, আচার ব্যবহারে এক বিন্দু এদিক ওদিক হয় না, আমরাই বা হব কেন? আমি দেখেছি, আমি এইরূপে আমার আচার ব্যবহার ধর্ম্ম কর্ম্ম বজায় রাখি বলে বড় বড় ইংরাজও এমন কি ছোটলাট পর্য্যন্ত আমার বেশ খাতির করেন। দেখুন, ইংরাজের ন্যায় পেট্রিয়ট আর কোন জাতি নাই। তাদের যদি কিছু মন্দ থাকে, তবু তারা সেটাকে—স্বধু তাদের বলেই আকৃড়ে থাকে। অন্য কোন লোককে তারা নিজত্ব বিসর্জ্জন দিতে দেখিলে অত্যন্ত ঘৃণা করে। এই

যে সব বিলাত ফেরৎ বাঙ্গালী-সাহেব আছেন—ইংরাজেরা মনে মনে তাঁহাদিগকে ঘৃণা করে।"

এইরূপ কথা বার্ত্তার পর উভয়ে বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহারা স্নান করিতে যাইলে বড়মা তাহাদের জন্য নানা প্রকার ফল, মূল ও মিষ্টান্ন সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া প্রথমে জলযোগ ও বেলা ১২টার পর অন্নভোজন করিয়া বিশ্রাম করিলেন। মধ্যাহ্ন কালে, বড় মা আহারাদি শেষ করিয়া তাঁহাদের কাছে বসিয়া মামার বাড়ী, বাপের বাড়ী, শ্বশুরবাড়ী, শরতের বাল্য-জীবন, বসন্ত বাবুর ও তাঁহার পত্নীর অকাল মৃত্যু প্রভৃতি কত বিষয়েরই আলোচনা করিলেন। অবশেষে বলিলেন—

"তা একদিন বৌকে আর ছেলে মেয়েকে সঙ্গে করে এন না? আহা সব আপনার লোক, অথচ কারও সঙ্গে দেখা শুনা নাই!"

হরনাথ বাবু তাঁহার এই অনুরোধ রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া অপরাহ্ণ কালে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়ের পূর্ব্বে তিনি তাঁহার "দিদির" পদধূলি গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। বড় মা রাজেন্দ্রকে সেদিন ছাড়িলেন না। শরৎ দেশে থাকিতে যত না হউক, তাঁহার বিলাত গমনের পর হইতে রাজেন্দ্র বড়মার "ঘরের ছেলে" হইয়া পড়িয়াছিলেন।

## ১৮

আরও দুইবৎসর কাটিয়া গেল। এই দুই বৎসরে জগতের নানারূপ পরিবর্ত্তন হইল। কত ভাগ্যবতী সোণার চাঁদ কোলে লইয়া হাসিলেন, আবার কত অভাগী সোণার চাঁদকে বিসর্জ্জন দিয়া শোক-সাগরে মগ্ন হইলেন। কত লোক ঋণ জালে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারী হইল, আবার কতলোক ভাগ্য দেবতার কৃপায় দীন দরিদ্র হইতে লক্ষপতি হইল।

রাজেন্দ্রনাথ বি, এল, পাশ করিয়া প্রথমে খুলনাতেই ওকালতি আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় বিশেষ সুবিধা না হওয়াতে বাবু হরদৎলালের পরামর্শে বাঁকীপুরে গিয়া ওকালতি আরম্ভ করিলেন। শরৎ পত্র দ্বারা হরদৎলালের সহিত রাজেন্দ্রনাথের পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন।

খুলনার জলবায়ু মিসেস রের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল না হওয়াতে, মিঃ রে কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়া বাঙ্গালা হইতে বিহারে বদলী হইলেন। তিনি প্রথমে ছয় মাসের অবকাশ লইয়াছিলেন, অবকাশ শেষ হইলে পাটনায় ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইলেন। বাঁকীপুরে শরতের পিতা বাস করিবার জন্য যে আবাস নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, সেই বাটী ভাড়া দেওয়া হইতেছিল। মিঃ রে মাসিক দেড়শত টাকাতে সেই বাটী ভাড়া লইলেন। তিনি বাঁকীপুরে গমন

করাতে রাজেন্দ্রনাথের অত্যন্ত আনন্দ হইল। রাজেন্দ্রনাথ সর্ব্বদাই মিঃ রের বাটীতে গমন করিতেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত উকীলের এইরূপ ঘনিষ্ঠতা দূষ্য বলিয়া, রাজেন্দ্রনাথ ফৌজদারী মোকদ্দমা ছাড়িয়া কেবল দেওয়ানী মোকদ্দমাই লইতে লাগিলেন। দেওয়ানী আদালতের উকীলদের সহিত ম্যাজিষ্ট্রেটের ঘনিষ্ঠতা ততটা দোষের নহে।

ব্রজেন্দ্র বাবু বাটীতেই ছিলেন, তবে মধ্যে মধ্যে বাঁকী-পুরে পুত্রের নিকট গিয়াও দুই চারি মাস থাকিতেন। রাজে-ন্দ্রের স্ত্রীও অধিকাংশ সময় বাঁকীপুরেই থাকিতেন।

রাজেন্দ্র বাঁকিপুরে গিয়া, বিলাতে শরৎকে আপনার ওকালতির কথা জানাইলেন। তিনি বাঁকিপুরে আছেন, বাবু হরদৎলাল তাঁহার পশার বৃদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে-ছেন, এবং সেই চেষ্টার ফলে তাঁহার বেশ পশার হইয়াছে, এই কথা রাজেন্দ্রের পত্রে অবগত হইয়া শরৎ বিশেষ আনন্দিত হইলেন। মিঃ রে যে বাঁকিপুরে আছেন, সে কথা রাজেন্দ্র শরৎকে জানিতে দিলেন না। শরৎ সাহস করিয়া মিঃ রেকে কোন পত্রাদি দেন নাই, সেইজন্য তাঁহার সহিত শরতের পত্র ব্যবহার ছিল না। মিঃ রে যে ব্রজেন্দ্র বাবুর বাটীতে গিয়াছিলেন, গোপালপুরে গিয়া বড়মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছিলেন, এক কথায় শরতের সহিত বেলার বিবাহের সম্বন্ধ যে সকল পক্ষ হইতেই স্থির হইয়া আছে, তাহা রাজেন্দ্র বিশেষ সাবধানতার সহিত

শরতের নিকটে গোপন করিয়াছিলেন। শরৎ পরীক্ষা দিয়া বিলাত হইতে আসিবার কিছু পূর্ব্বে রাজেন্দ্রের নিকট হইতে যে পত্র পাইয়াছিলেন, তাহাতে রাজেন্দ্র লিখিয়াছিলেন যে, মিঃ রে স্ত্রীর পীড়ার জন্য দীর্ঘকালের জন্য অবকাশ গ্রহণ করিয়াছেন। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে পাহাড়ে অথবা সমুদ্রবক্ষে কিছুদিন বাস করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। সম্প্রতি মিঃ রে পত্নীকে লইয়া হিমালয় প্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাহাতে যদি উপকার না হয় তবে সম্ভবতঃ তিনি সপরিবারে ইউরোপ যাত্রা করিবেন।

বড়মার পত্রে শরৎ অবগত হইলেন যে, তিনি কাশীধামে শিব-প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় জীবনের অবশিষ্টকাল যাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি উৎসুক চিত্তে শরতের প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষা করিতেছেন। শরৎ দেশে আসিলে তিনি শরতের বিবাহ দিয়াই কাশীবাস করিতে যাইবেন। তিনি শরতের জন্য একটি কন্যাও দেখিয়াছেন। মেয়েটি তাঁহাদেরই আত্মীয়া কন্যা, দেখিতে বেশ সুশ্রী, বাড়ন্ত ইত্যাদি, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য রাজেন্দ্রের বিশেষ অনুরোধে বড়মা শরতের নিকটে কন্যার পরিচয় প্রকাশ করেন নাই।

লণ্ডনে অবস্থানকালে শরতের একটা বড় সুবিধা হইয়াছিল। তিনি যে বৎসর বিলাতে যান তাহার পর বৎসর কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ এন ভাসু অর্থাৎ নরেনচন্দ্র বসু হাইকোর্টের দীর্ঘ অবকাশ উপলক্ষে বিলাতে

গিয়াছিলেন। মিঃ ভাস্কর এক পুত্রের সহিত শরৎ কিছুদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে শরৎ দুই একবার সতীশের সঙ্গে মিঃ ভাস্কর বাটীতে গিয়াছিলেন কিন্তু মিঃ ভাস্কর সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় বিশেষ হয় নাই। মিঃ ভাস্কর পুত্রের বন্ধুর সহিত আর কি আলাপ করিবেন।

লণ্ডনে একটি ক্লাবে শরৎ মিঃ ভাস্করকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন। মিঃ ভাস্কর এই [illegible] পুত্রের সহপাঠিকে দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। শরৎ বার [illegible] পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন [illegible] তিনি [illegible] নানাপ্রকার উৎসাহ [illegible] পাইল [illegible] কলিকাতায় [illegible] সুবা [illegible] বলিলেন।

পর বৎসর শরতের শেষ পরীক্ষা। [illegible] উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার আনন্দ আর ধরে না। [illegible] আত্মীয় বন্ধু পরিত্যাগ করিয়া এই দূরদেশে [illegible] যাবৎ বাস করিতেছেন সেই উদ্দেশ্য এতদিনে সফল হইবার সম্ভাবনা হইল। এখন বোধ হয় তিনি মিঃ ব্রের কন্যার পাণিপ্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকটে গমন করিলে তিনি অসম্মত হইবেন না। হায় নির্ব্বোধ! তুমি কল্পনা জাল বিস্তার করিবার অনেক পূর্ব্বেই যে বিধাতা তোমার অদৃষ্টফলকে তাঁহার

অযথা লেখনী সঞ্চালন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার তুমি কিছুই জান না।

শরতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সংবাদ পাইয়া, রাজেন্দ্র-নাথ বাঁকিপুর হইতে যৎপরোনাস্তি আনন্দ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলেন এবং মিঃ রের ঠিকানা জানিতে পারিলে যে তাঁহাকেও এই সংবাদ জানাইবেন এ কথাও পত্র মধ্যে উল্লেখ করিলেন। ঘোড়াঘাট হইতে ব্রজেন্দ্র বাবুও আনন্দ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলেন। মিঃ ভাস পত্রদ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং লিখিলেন যে, "কলিকাতায় আসিয়া তুমি আমার বাটীতেই বাস করিও। আপাততঃ তোমাকে স্বতন্ত্র বাসার বন্দোবস্ত করিতে অথবা হোটেলে গিয়া উঠিতে হইবে না।" বাবু [illegible] [illegible] আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক শরৎকে পত্র লিখিলেন।

শরৎ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্কটলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, জার্ম্মণী, ইটালী প্রভৃতি দেশে প্রায় ছয় মাস ভ্রমণ করিয়া ফিরিবার [illegible] ষ্টিমারে আরোহণ করিলেন।

শরৎ ইংলণ্ডে যাইবার সময় ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলপথে এলাহাবাদ ও জব্বলপুর হইয়া বোম্বাই গিয়াছিলেন, আসিবার সময় বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ দিয়া আসিবার ইচ্ছা করিলেন। বোম্বায়ে উপস্থিত হইয়াই তিনি মিঃ ভাসকে, রাজেন্দ্রকে এবং ব্রজেন্দ্র বাবুকে টেলিগ্রাম করিয়া আপনার আগমন-বার্ত্তা জানাইলেন। তিনি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেল পথ দিয়া আসিলে

পথে বাঁকিপুরে রাজেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইত, কিন্তু তিনি বেঙ্গল নাগপুর রেল পথ দিয়া আসাতে একেবারে কলিকাতায় আসিতে হইল।

যথা সময়ে শরৎ হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখি-লেন যে ষ্টেশনে মিঃ ভাস্থ ও তাঁহার পুত্র তাঁহাকে লইতে আসিয়াছেন। প্রথম সাক্ষাতে অভিবাদন প্রভৃতি শেষ হইলে মিঃ ভাস্থ শরৎকে এবং পুত্রকে সঙ্গে লইয়া মোটারে আরোহণ করিলেন এবং একজন কর্ম্মচারীকে শরতের লগেজ প্রভৃতি লইয়া আসিবার জন্য ষ্টেশনে রাখিয়া আসিলেন।

শরৎ তিন বৎসর দেশে ছিলেন না, এই তিন বৎসরে কলিকাতায় কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কত সরু গলি-পথ চওড়া রাস্তা হইয়াছে, কত খোলার ঘর চারিতল পাঁচতল অট্টালিকাকে স্থান ছাড়িয়া দিয়া লজ্জায় চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে। কত অসমাপ্ত অট্টালিকা সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হইয়া অধিকারীর ধনবত্তার পরিচয় দিতেছে। এই সকল দেখিতে দেখিতে শরৎ মিঃ ভাস্থ ও তাহার পুত্রের সহিত মিঃ ভাস্থর আলয়ে উপস্থিত হইলেন। এ বাটী তাঁহার অপরিচিত নহে, একাধিকবার তিনি এই বাটীতে আসিয়াছিলেন। বাটীতে দুই চারিজন পুরাতন ভৃত্যকেও দেখিতে পাইলেন, তাহারা সসম্ভ্রমে নূতন সাহেবকে সেলাম করিল।

শরৎ সেই দিনই গোপালপুরে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, মিঃ ভাসু বলিলেন—

"আজ যাইও না। ষ্টীমার ও রেল-পথে আগমন জনিত কষ্টে তোমার চেহারা বিশ্রী হইয়া গেছে। দুই দিন বিশ্রাম কর, তারপর যাইও। একান্ত যদি তোমার জ্যেঠাই মাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাক, কাল তাঁহাকে একখানা পত্র দাও, দিয়া পরশ্ব অপরাহ্ন কালে কি তার পরদিন প্রাতে যাইও।"

মিসেস ভাসুও শরৎকে কিছুতেই ছাড়িলেন না। তিনি যদিও পূর্ব্বে শরৎকে কখনও দেখেন নাই, তথাপি তাঁহাকে পুত্রের বন্ধু জানিয়া স্নেহময়ী জননীর ন্যায় বলিলেন—

"না বাবা আজ কাল দুই দিন বিশ্রাম কর। প্রায় একমাস ধরে জলে জলে আর' রেলে ঘুরে শরীর যে একেবারে মাটী হয়ে গেছে। দুই চারিদিন থাক, তারপর যেয়ো।"

শরৎ তাঁহাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ তাঁহার বন্ধু মিঃ ভাসুর পুত্র অবনীকুমার ওরফে "ছোট সাহেব" যখন তাঁহাকে নির্জ্জনে বলিলেন, "বাড়ীতেও এক জ্যেঠাইমা আছেন তা তাঁকে দুদিন পরে দেখা দিলেও কোন ক্ষতি নাই। কোন চাঁদপানা মুখ ত তোমার আশাতে পথপানে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে না, তা বাড়ী যাবার জন্য এত তাড়া কেন? জ্যেঠাইমা যদি দীর্ঘ তিন বৎসর তোমাকে না দেখে জীবন ধারণ করে থাকতে পারেন,

তাহ'লে আর তিন চারি দিনও তিনি কোন রকমে বেঁচে থাক্‌তে পার্ব্বেন।" তখন শরৎ আর বাটী যাইবার নাম করিলেন না।

দুইদিন কলিকাতায় বিশ্রাম করিয়া শরৎ গোপালপুরে যাত্রা করিলেন। পূর্ব্বেই তিনি বড় মাকে আপনার আগমন সংবাদ দিয়াছিলেন এবং প্রাতঃকালেই বাটীতে গিয়া আহারাদি করিবেন এ কথাও লিখিয়াছিলেন। বড় মা সেই পত্র পাইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। যে দিন শরতের বাটী যাইবার কথা, সেই দিন তিনি ভোর বেলা উঠিয়া স্নান ও পূজা আহ্নিক শেষ করিলেন এবং প্রবাস হইতে প্রত্যাগত দেবর-পুত্রের আহারের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। বাছা আমার বিদেশ বিভুঁঞে কিছুই খেতে পায় নি, চারিটি বিস্কুট খেয়ে কি বাঙ্গালীর পেট ভরে? হয়ত বাছাকে আধপেটা খেয়েই থাক্‌তে হয়েছে।" এইরূপে চিন্তা করিয়া তিনি শাক, সুক্তা, ঘণ্ট, ডালনা, মাছের ঝোল, মাছের অম্বল, পিষ্টক, পায়েস প্রভৃতি কত কি রন্ধনের আয়োজন করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার আর তৃপ্তি হয় না, যখন যে ব্যঞ্জনের কথা মনে পড়ে, সেইটাই রাঁধিয়া খাওয়াইতে সাধ হয়। এইরূপে তিনি ১০।১২টি ব্যঞ্জন রন্ধনের আয়োজন করিলেন। এক একটি ব্যঞ্জন হাঁড়িতে সিদ্ধ হইতে দেন আর একবার করিয়া ছুটিয়া গিয়া পথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। আবার পর মুহূর্ত্তে পাছে ব্যঞ্জন ধরিয়া পুড়িয়া যায় তাই ছুটিয়া রন্ধন-

শালাতে প্রবেশ করেন। এই ভাবে বড়মার রন্ধন কার্য্য চলিতেছিল, এমন সময় শরৎ প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া ডাকিলেন—

"বড়মা।"

"বাবা।"

আর বড়মার কথা বাহির হইল না, তিনি আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন। শরৎ গিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। বড়মা নয়নে অশ্রু মোচন করিতে করিতে শরতের সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার মাথাটা টানিয়া লইয়া নিজের বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন আর মধ্যে মধ্যে তাঁহার চিবুকে অঙ্গুলী স্পর্শ করিয়া অঙ্গুলী চুম্বন করিতে লাগিলেন। পাকগৃহে তাঁহার মাছের ঝোলে ঝোল মরিয়া চড়্‌চড়ি হইতেছিল, সেদিকে তাঁহার আর নজর গেল না।

২০

মধ্যাহ্নকালে আহারাদির পর বড়মার সঙ্গে শরতের অনেক কথাবার্ত্তা হইল। নানারূপ কথাবার্ত্তার পর প্রায়শ্চিত্তের কথা উঠিলে, শরৎ বলিলেন—

"আমি যাবার পূর্ব্বে তোমার কাছে সত্য করে ছিলেম যে, ফিরে এসে প্রায়শ্চিত্ত করব। তা আমার সে কথার অন্যথা হবে না। কিন্তু একটা কথা, মাথা নেড়া না করলে কি প্রায়শ্চিত্ত হয় না?"

বড়মা শরতের কথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিলেন ; বলিলেন,

"পাগল আর কি ? মাথা নেড়া কর্ত্তে হবে কি না, তা আমি কি বলব ? আমিত আর ভট্চাজ্জি বামুনের মেঁয়ে নই ! গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা কর্ব্ব, তিনি যা ব্যবস্থা দেবেন তাই করিস্।"

শরৎও এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। জানিতেন যে, তাঁহাদের কুলগুরু পণ্ডিত হরবল্লভ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট স্কুলে পণ্ডিতি করিতেন, তিনি সামান্যরূপ ইংরাজীও জানেন এবং সে কালের অধ্যাপক ব্রাহ্মণের ন্যায় ধর্ম্মভীরু ও সরল হইলেও প্রচণ্ড রক্ষণশীল নহেন, সুতরাং তাঁহার ব্যবস্থা অনুসারে কার্য্য করা নিজের পক্ষেও ক্লেশকর হইবে না এবং বড়মার পক্ষেও সন্তোষকর হইবে। অধিকন্তু তিনি গ্রামের চক্রবর্ত্তী বাবুদের গুরু বলিয়া সেই গ্রামের কি ইতর কি ভদ্র সকলেই তাঁহাকে যথোচিত শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহার বাক্য "বেদবাক্য" বলিয়া শিরোধার্য্য করিতেন। এমন কি বিদ্যালঙ্কার মহাশয় যদি বলেন যে শরতের প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই, তাহা হইলেও গ্রামের লোকে এবং তাহার বড়মা সেই কথাই শিরোধার্য্য করিবেন।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিবাস বাঁসবেড়িয়া গ্রামে। পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহাকে আনিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল, সন্ধ্যার সময় বিদ্যালঙ্কার মহাশয় গোপালপুরে উপস্থিত হইলেন।

রাত্রিকালে আহারাদির পর বড়মা গুরুদেবের নিকটে শরতের প্রায়শ্চিত্তের কথা উত্থাপন করিলেন। শরৎ যে বিলাতে গিয়াছেন, একথা বড়মা গ্রামের সকলের নিকটে গোপন রাখিলেও গুরুদেবের নিকটে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। গুরুর সঙ্গে কি লুকোচুরি চলে?

শরৎ বলিলেন,

"প্রায়শ্চিত্ত আমি করিব—কিন্তু একটা কথা এই যে, মাথা ন্যাড়া না কল্লে কি চলে না?"

শরতের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় দন্তহীন মুখ বিস্ফারিত করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন,

"চলিবে না কেন ভাই? সব চলে। ব্রাহ্মণের ছেলে যদি সহস্র গায়ত্রী জপ করে ও গঙ্গা স্নান করে, তাহা হইলে আর কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না, তুমি আমার সঙ্গে চল, তিন দিন আমার বাটীতে থাকিয়া গঙ্গাস্নান করিবে আর সহস্র গায়ত্রী জপ করে আমার প্রসাদ পাইবে। ইহা অপেক্ষা অন্য কঠোর প্রায়শ্চিত্ত আর আবশ্যক নাই। কথা কি জান, তোমায় সমাজকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। আমার বাটী হইতে আসিয়া গ্রামে একদিন সকলকে খাওয়াইয়া দাও। ব্রাহ্মণদের একটু বেশী রকম দক্ষিণা দিও, তাহলেই সকলে সন্তুষ্ট হবে।"

গুরুদেবের এই পরামর্শই শরৎ ও বড়মা সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন। গুরুদেব পরদিন প্রাতঃকালে গোপালপুরের

যাবতীয় ব্রাহ্মণ ও মুরব্বিস্থানীয় সৎশূদ্রগণকে শরতের বাটীতে আহ্বান করিয়া শরতের বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলাতে গমন এবং তজ্জনিত প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিলেন। তাঁহার প্রস্তাবে কেহই আপত্তি করিতে সাহস করিলেন না। বৃদ্ধ গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন,

"বিদ্যালঙ্কার মহাশয় সাক্ষাৎ মনুসংহিতা। উনি যা ব্যবস্থা করবেন, তার উপর কি আর কথা আছে? শরৎ বড় ভাল ছেলে, হবে না কেন? কেমন বাপের ছেলে? ওর বাবা বসন্তকে আমি কোলে করেছি—আহা সব কোথায় গেল—আমরাই নিকষা হয়ে এই রাবণের পুরী আগলে পড়ে আছি। তা বিদ্যালঙ্কার মহাশয় যা ব্যবস্থা কল্লেন সেই অনুসারেই কাজ কর—আর বোল আনা দক্ষিণার ব্যবস্থা কোরো। প্রায়শ্চিত্ত আবার কি? আমরাই সমাজ—আমরাই প্রায়শ্চিত্ত। কি বল ঘোষজা?"

বৃদ্ধ রামচরণ ঘোষ কর যোড়ে বলিলেন,

"আজ্ঞা, আমরা হচ্ছি ব্রাহ্মণের দাস কায়স্থ। আপনারা মণিব, আমরা চাকর। আপনারা যা হুকুম করবেন তাই আমাদের শিরোধার্য্য। আমাদের আর মতামত কি?"

অবশেষে সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে স্থির হইল যে, শরৎ তিন দিন গুরুগৃহে বাস করিয়া সহস্র গায়ত্রী জপ ও গঙ্গাস্নান করিবেন এবং তাহার পর বাটীতে আসিয়া একবার ব্রাহ্মণ-

ভোজন করাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে এক টাকা করিয়া দক্ষিণা দিবেন, তাহা হইলে আর কোন গোলযোগই হইবে না।

শরৎ এই ব্যবস্থামতই কার্য্য করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে গুরুদেবের সহিত বাঁশবেড়িয়াতে গমন করিলেন এবং তিন দিন তথায় অবস্থান করিয়া চতুর্থ দিনে বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দুই তিন দিন পরেই মহা সমারোহে ভোজ দেওয়া হইল, গুরুদেব সে দিনও উপস্থিত ছিলেন। তিনি শরতের বড়মার হাতের অন্ন গ্রহণ করাতে সকলেই বিনা বাক্যব্যয়ে শরতের বাটীতে অন্নগ্রহণ করিলেন—শরৎকে লইয়া একপঙক্তিতে বসিয়া আহার করিলেন। শরৎ ব্রাহ্মণদিগকে এক টাকা করিয়া দক্ষিণা দিলেন।

বড়মার প্রধান আশঙ্কা দূর হইল। তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইতে লাগিল যে হরনাথ বাবুর কন্যার সহিত বিবাহের প্রস্তাব শরৎকে শুনাইয়া দেন, কিন্তু রাজেন্দ্র তাঁহাকে মাথার দিব্য দিয়া নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন। সে দিব্য অগ্রাহ্য করিলে পাছে রাজেন্দ্রের কোন অমঙ্গল হয়, সেই ভয়ে তিনি আর শরতের নিকটে বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন না।

শরৎ মনে করিয়াছিলেন যে, এইবারে বড়মা নিশ্চয়ই তাঁহাকে বিবাহ করিবার জেদ করিবেন। কিন্তু বড়মা সে কথার কোন উচ্চবাচ্য না করাতে অগত্যা শরৎকেই সে বিষয়ে নীরব থাকিতে হইল। তিনি কোন্ লজ্জায় বড়মার কাছে নিজের বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন ?

প্রায়শ্চিত্তের গোলযোগ মিটিয়া গেলে, একদিন বড়মা কাশিবাসের কথা তুলিলেন। বলিলেন,—

"বাবা, এখন তুই বড় হয়েছিস্, এইবার তোর বিষয়কার্য্য তুই সব দেখে নে, আমাকে রেহাই দে, আমি একবার গুরু-দেবকে সঙ্গে নিয়ে তীর্থ ঘুরে আসি। অনেক দিন থেকে সাধ আছে কাশিতে ৺শিব-প্রতিষ্ঠা করে শেষ বয়স বাবার আশ্রয়ে কাটিয়ে দিব। যাতে আমার সেই সাধ পূর্ণ হয় তুই এইবার তার ব্যবস্থা কর।"

বড়মার এই ইচ্ছার আভাষ শরৎ পূর্ব্বেই পাইয়া-ছিলেন। তিনি জানিতেন যে বড়মাকে সঙ্কল্পচ্যুত করা সহজ হইবে না। আর তাহাতে লাভই বা কি? শরৎকে ত এখন স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বাস করিতেই হইবে। বড় মা শ্বশুরের ভিটা ছাড়িয়া কিছুতেই কলিকাতায় গিয়া বাস করিবেন না, দুই চারি দিনের জন্য যাইতে পারেন, কিন্তু দীর্ঘকাল তিনি কখনই কলিকাতায় থাকিতে সম্মত হইবেন না। যদি তিনি কিছু দিন তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া হৃদয়ে শান্তি পান, তাহাতে আপত্তি করিবার কি আছে? এই সকল চিন্তা করিয়া শরৎ বলিলেন,—

"তা বেশ ত; গুরুদেবের সঙ্গে দিন কতক কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, মথুরা ঘুরে এস। আমাকেও ত এখন কলিকাতাতেই থাকতে হবে। তার পর তুমি যখনই বাড়িতে আসবে, তখন আমিও বাড়িতে আসব। মধ্যে মধ্যে এসে বাড়ী ঘর দেখে

যাব। কিন্তু এক কথা বিদেশে পয়সা খরচে যেন কৃপণতা কর' না। তোমার সঙ্গে ঝি, চাকর ও গুরুদেব যাবেন। তুমি আর গুরুদেব সেকেণ্ড ক্লাসে যেও। টাকার জন্ম যদি কষ্ট স্বীকার কর তাহ'লে ভাল হবে না বলচি।"

বড়মা শরতের প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। পরদিন হইতেই বড়মার তীর্থ যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। যথাসময়ে গুরুদেবের নিকটে সংবাদ প্রেরিত হইল, তিনি নির্দ্দিষ্ট দিনে গোপালপুরে আসিলেন। শরৎ তাহাদিগকে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া স্বয়ং কলিকাতায় গমন করিলেন।

## ২১

গোপালপুর হইতে আসিয়া কলিকাতায় মিঃ ভাস্থর বাটীতে তিন চারিদিন বাস করিয়া শরৎ যোড়াগাছি গ্রামে মাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়া তাঁহাকে হতাশ হইতে হইল। ব্রজেন্দ্র বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলে, প্রাচীন কর্ম্মচারীরা তাঁহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিয়া জানাইলেন যে ব্রজেন্দ্র বাবু প্রায় এক মাস পূর্ব্বে সপরিবারে বাঁকাপুরে রাজেন্দ্রের নিকটে গিয়াছিলেন। সংপ্রতি পত্র আসিয়াছে যে তিনি শীত কয়মাস কাশীতে থাকিয়া ফাল্গুন মাসের শেষে যোড়াগাছিতে ফিরিয়া আসিবেন।

সে দিন ফিরিবার উপায় ছিল না, বিশেষতঃ ব্রজেন্দ্র বাবুর কর্ম্মচারীরাও তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িলেন না।

অগত্যা ব্রজেন্দ্র বাবুর বাটীতে সেই রাত্রি তাঁহাকে থাকিতে হইল। অপরাহ্ণ কালে তাঁহার একবার ইচ্ছা হইল যে সেই নদীরতীরে আবার সেই বটতলায় তেমনই ভাবে বসিয়া থাকেন। দূর হইতে সেই সঙ্গীত সুধা—সেই—

"যেদিন পরাণে তোমার মধুর মূরতি জাগে।
সেদিন অমিয়-উৎস বহে হৃদয় মাঝে।"

গানটি—তেমনই মধুর স্বরে তাঁহার কর্ণে আসিবে না কি?

পরদিন তিনি আহারাদি করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। খুলনায় একবার সংবাদ লইবার চেষ্টা করিলেন যে মিঃ রে এখন কোথায় আছেন। কিন্তু কেহই তাঁহাকে সে সংবাদ দিতে পারিল না। হায় বেলা!

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শরৎ হাইকোর্টে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। মিঃ ভাস্ব তাঁহাকে স্বতন্ত্র বাসা করিতে দিলেন না। সুতরাং শরৎ বাধ্য হইয়া পিতৃতুল্য মিঃ ভাস্বর আশ্রয়েই থাকিতে বাধ্য হইলেন। বিলাতে মিঃ ভাস্বর সহিত শরতের আলাপ হইয়াছিল, কিন্তু সেখানে তিনি শরতের গুণ-গ্রামের বিশেষ পরিচয় পান নাই। পুত্রের সহপাঠী এবং স্বদেশ-বাসী বলিয়াই তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিয়াছিলেন। কলিকাতায় শরৎ মিঃ ভাস্বর বাটীতে অবস্থান করিলে, তিনি শরতের সরলতা, বিনয়, নম্রতা এবং বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ

করিলেন। শরতের আকৃতিতে বিশেষতঃ তাঁহার চক্ষুতে এমন একটা ভাব ছিল, যাহা দেখিলে, দর্শক নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত, তাঁহাকে ভাল বাসিয়া ফেলিত। সুতরাং মিঃ ভাস্কু এবং তাঁহার পরিজনবর্গও যে শরৎকে অতি অল্পদিনের মধ্যে "ঘরের ছেলে" করিয়া ফেলিলেন, একথা বলাই বাহুল্য।

শরতের যে আর্থিক অবস্থা ভাল, ব্যারিষ্টারি না করিলেও যে তিনি কলিকাতায় গাড়ী ঘোড়া রাখিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন, মিঃ ভাস্কু সংবাদ পাইয়াও শরৎকে পৃথক্ বাসা করিতে দিলেন না। অধিকন্তু যাহাতে শরৎ অল্প দিনের মধ্যেই পশার করিতে পারেন তাহার জন্যও সবিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

মিঃ ভাস্কুর চেষ্টা ফলবতী হইতে বিলম্ব হইল না। তিনি অনেক মামলাতেই শরৎকে নিজের সহকারীরূপে সঙ্গে রাখিতেন। মিঃ ভাস্কু ফৌজদারী মামলাতেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন, ফৌজদারী মামলায় তিনি যদি আসামীর পক্ষ সমর্থন করিতেন তাহা হইলে সেই আসামীর নিষ্কৃতি লাভ সম্বন্ধে লোকের মনে আর কোন সন্দেহ থাকিত না। হাইকোর্টের ফৌজদারী বিভাগে তাঁহার প্রত্যহই দুই একটি মামলা থাকিত। শরৎ তাঁহার সহকারীরূপে হাইকোর্টে উপস্থিত থাকাতে ৩।৪ মাসের মধ্যেই ফৌজদারী মামলায় আসামীর পক্ষ সমর্থনের কৌশল শিখিয়া ফেলিলেন। কোন কোন মামলায় মিঃ ভাস্কু

শরতের উপরেই আসামীর পক্ষ সমর্থনের ভার দিতেন, শরৎ সুন্দর রূপে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন।

এত শীঘ্র যে শরৎ ব্যারিষ্টারিতে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রধান একটি কারণ এই যে তিনি বিলাত যাইবার পূর্ব্বে, ওকালতি পরীক্ষা দিবার জন্য অনেক আইন-কানুন কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। অন্যান্য নবীন ব্যারিষ্টারের এ সুবিধা ছিল না। বিচারপতিরাও অনেক সময় শরতের বক্তৃ-তার প্রশংসা করিতেন, সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে দুই চারি বৎসরের মধ্যেই শরৎ নবীন ব্যারিষ্টারগণের মধ্যে প্রধান হইয়া উঠিবেন।

ক্রমে ক্রমে হাইকোর্টের বাহিরেও তাঁহার ডাক হইতে লাগিল। পুলিশ আদালতে, শিয়ালদহের আদালতে এবং আলিপুরের আদালতেও তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে যাইতে হইত। ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সদয় হইয়াছিলেন, তিনি কোন মামলাতেই ঠকেন নাই সুতরাং এমন ব্যারিষ্টারের উন্নতি ও খ্যাতি অনিবার্য্য।

পূজার দীর্ঘ অবকাশের পর হাইকোর্ট খুলিলে শরৎ মিঃ ভাস্থর সহিত হাইকোর্টে বাহির হইতে আরম্ভ করেন। মাঘ মাসের শেষ ভাগেই তিনি একজন উদীয়মান ব্যারিষ্টার বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন। শরৎ নিজ ব্যবসায়ে দ্রুত-গতিতে উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন সত্য, কিন্তু যাহার জন্য তিনি সুদূর ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন, সে আজ কোথায়?

শরৎ সর্ব্বদাই বেলার চিন্তায়, বেলার ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। মামলা মোকদ্দমার বিষয় চিন্তা করিয়া যেটুকু সময় পাইতেন, তাহা বেলার চিন্তায় সমর্পণ করিতেন। বেলা এখন কত বড় হইয়াছে, তাহার বিবাহ হইয়াছে কিনা, হরনাথ বাবু কোথায় আছেন, তাঁহারা এখনও শরৎকে মনে রাখিয়াছেন কি না, এইরূপ কত চিন্তাই তাঁহার মনে উদয় হইত। রাজেন্দ্রের নিকট হইতে তিনি সর্ব্বদাই পত্র পাইতেন, কিন্তু সেই সকল পত্রে বেলা বা হরনাথ বাবুর নামগন্ধও থাকিত না। অতি সাধারণ কথা—"আমি বেশ ভাল আছি, খোকা বড় দুষ্ট হইয়াছে, সে সব কথা কহিতে শিখিয়াছে। বাবা মা প্রভৃতি এলাহাবাদ হইতে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন, তোমার পশার হইতেছে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, বাবু হরদৎলাল অতি সদাশয় লোক, প্রায় প্রত্যহ আমার সংবাদ লইয়া থাকেন।" এইরূপ সংবাদেই পত্রগুলি পরিপূর্ণ, যেন শরৎ ঐ সকল অত্যাবশ্যক সংবাদ জানিবার জন্য আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

রাজেন্দ্রের পত্র পাঠ করিয়া শরতের রাগও হইত, আবার মনে করিতেন যে, "সে বোধ হয় হরনাথ বাবুদের কোন সংবাদ পায় নাই, পাইলে নিশ্চয়ই আমাকে লিখিত।"

ফাল্গুন মাসের ১০ই তারিখে শরৎ সন্ধ্যার সময় হরদৎ লালের নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন। পত্রের মর্ম্ম এই যে একজন স্থানীয় জমিদারের পুত্রের বিরুদ্ধে নরহত্যার

অভিযোগ হইয়াছে। মামলা দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে, আর ৮।১০ দিন পরেই দায়রা আরম্ভ হইবে। রাজেন্দ্র বাবুর পরামর্শে সেই জমিদার শরৎকে আসামীর পক্ষ সমর্থনে নিযুক্ত করিতে চাহেন। তিনি প্রত্যহ আড়াইশত টাকা ফী, এবং মোকদ্দমায় আসামী নিষ্কৃতি পাইলে ১০০০০ দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিতে সম্মত আছেন। যদি এই মোকদ্দমা লওয়া মত হয়, তাহা হইলে সত্বর যেন সে সংবাদ প্রেরণ করা হয়।

মিঃ ভাস্কে শরৎ এই পত্রের মর্ম্ম জ্ঞাপন করিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং শরৎকে সেই মামলা গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিলেন। শরৎ সেই রাত্রিতেই হরদৎলালকে সম্মতি সূচক পত্র দিলেন। বিলাত হইতে আসিয়া অবধি রাজেন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই, বন্ধুকে দেখিবার জন্যও তিনি অত্যন্ত ব্যকুল হইয়াছিলেন!

২০শে ফাল্গুন রবিবার। ঐদিন মধ্যাহ্নকালে তিনি হরদৎ লালের নিকট হইতে টেলিগ্রাফ পাইলেন।

"অদ্য রাত্রেই যাত্রা কর। কাল সোমবার মামলা আরম্ভ হইবে।"

টেলিগ্রাম পাইয়া শরৎ সেই দিন রাত্রিতেই বাঁকীপুর যাত্রা করিলেন।

## ২২

বাবু মথুরাপ্রসাদ বাঁকীপুরের একজন ধনবান ব্যবসায়ী জমিদার। তাঁহার একমাত্র পুত্র কেশবপ্রসাদ পঞ্চবিংশতি-বর্ষীয় যুবক। ধনবান পিতার একমাত্র পুত্র সুতরাং সে লেখপড়া শিখে নাই; কারণ তাহাকে ত চাকরী করিতে হইবে না। যাহাদিগকে চাকরী করিয়া, ডাক্তারি বা ওকালতি করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তাহারাই লেখা-পড়া করে। তাহার ন্যায় ধনবান পিতার সন্তানের লেখাপড়া করিবার কোন প্রয়োজন নাই। সুতরাং সে লেখাপড়া শিখিল না, অধিকন্তু সংসর্গদোষে নানাপ্রকার নেশা করিতে শিখিল, বারবণিতা মহলে তাহার পসার প্রতিপত্তি হইল।

এই কেশব প্রসাদই পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত খুনি মামলার আসামী। বাঁকিপুরে লছমনিয়া নাম্নী এক বার-বনিতা ছিল, কেশবলাল তাহার বিশেষ অনুগৃহীত। এই অনুগ্রহের প্রতি-দান-স্বরূপ কেশবলাল তাহাকে ৩।৪ হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছিল। তাহার মনে ধারণা হইয়াছিল যে লছমনিয়া তাহাকে ব্যতীত আর কাহাকেও অনুগ্রহ করে না। কিন্তু একদিন তাহার সে ভ্রম ঘুচিল। সে জানিতে পারিল যে, করমচাঁদ নামক একজন ধনবান মাড়োয়ারীও গোপনে লছ-মণিয়ার বাটীতে যাতায়াত করে। এই ঘটনা জানিতে পারিয়া কেশবপ্রসাদ লছমণিয়া এবং করমচাঁদকে খুন করিবে

বলিয়া ভয় দেখাইয়া ছিল। অবশ্য ভীতি-প্রদর্শনটা গোপনে হয় নাই, কেশবপ্রসাদের প্রাণের বন্ধুদিগের সমক্ষেই হইয়া ছিল।

ইহার কিছুদিন পরে একদিন রাত্রিকালে লছমণিয়া খুন হইল। পরদিন প্রাতঃকালে তাহার শয়নকক্ষে দেখা গেল, লছমনিয়ার মৃতদেহ পড়িয়া আছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গে আঘাতের চিহ্ন। তাহার অলঙ্কারগুলি অপহৃত হইয়াছে। পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তে প্রবৃত্ত হইল। লছমণিয়ার বাক্স তোরঙ্গ প্রভৃতি অনুসন্ধান কালে, একটা তোরঙ্গের ভিতরে তিনখানা পত্র পাওয়া গেল। পত্রগুলি অনেকদিন পূর্ব্বে কেশবলাল লিখিয়াছিল, পত্র তিনখানির মর্ম্ম একই প্রকার। প্রথম পত্র ভাগলপুর হইতে কেশবপ্রসাদ লিখিয়াছে। তাহাতে সে লছ-মণিয়াকে বলিয়াছে যে, 'যেদিন সে লছমণিয়াকে বিশ্বাস-ঘাতিনী বলিয়া বুঝিতে পারিবে সেই দিনই তাহাকে হত্যা করিবে। আর দুইখানি পত্রের মর্ম্মও এইরূপ। পত্র তিন খানিই ১৩০৮ সালে যথাক্রমে আশ্বিন কার্ত্তিক ও ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ হত্যাকাণ্ডের তিন বৎসর পূর্ব্বে লিখিত।

পত্র তিনখানি হস্তগত করিয়া পুলিশ কেশবপ্রসাদকে হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিল এবং তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে প্রথম মামলায় শুনানি হইল, পুলিশ কেশবলালের বিরুদ্ধে কয়েকজন সাক্ষীও আদালতে হাজির করিয়াছিল। কেশবলাল সভয়ে দেখিল যে তাহারই কোন

কোন প্রাণের বন্ধু তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল। কেশবপ্রসাদ যে লছমণিয়াকে খুন করিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিল, একথা তাহারা হলফ করিয়া বলিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট মামলা দায়রা সোপর্দ্দ করিলেন। বাবু মথুরাপ্রসাদের সহিত রাজেন্দ্রের আলাপ পরিচয় ছিল না। তাই রাজেন্দ্র হরদৎলালের দ্বারা মথুরাপ্রসাদের নিকটে কলিকাতা হইতে শরৎকে আনাইবার প্রস্তাব করিলেন। মথুরাপ্রসাদও শুনিয়াছিলেন যে কলিকাতা হাইকোর্টে শরৎ ব্যারিষ্টার যে আসামীর পক্ষে দাঁড়াইতেছেন, সেই আসামীই অব্যাহতি লাভ করিতেছে। মথুরাপ্রসাদ একটু কৃপণ ছিলেন। অন্য কেহ হয়ত তাঁহার মত অবস্থায় পড়িলে একমাত্র পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য হাইকোর্ট হইতে জ্যাকসন বা অন্য কোন বড় ব্যারিষ্টার আনাইবার ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন মথুরাপ্রসাদ ভাবিলেন যে দায়রাতে একজন অল্প টাকার ব্যারিষ্টার দেওয়া যাক, তাহাতে যদি কোন ফল না হয়, তখন হাইকোর্টে আপিল করিয়া না হয় সেইখানে একজন বড় ব্যারিষ্টার দেওয়া যাইবে।

এইরূপ হিসাব করিয়াই তিনি রাজেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব অনুসারে শরৎকেই পুত্রের পক্ষ সমর্থনে নিযুক্ত করিলেন। হরদৎলাল ভগবানের নিকট মনে মনে প্রার্থনা করিলেন, যেন শরৎ আসিয়া এই মামলায় জয়লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহার বন্ধু পুত্র শরতের বাঁকীপুরেও যথেষ্ট পসার হইবে,

চাই কি তাহা হইলে শরৎ স্থায়ীভাবে বাঁকীপুরেই থাকিয়া যাইতে পারেন। তখনও বাঁকীপুরে হাইকোর্ট হয় নাই, তবে ভবিষ্যতে হইবে, তাহা সকলেই জানিতেন। ভগবান হরদৎলালের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন কিনা তাহা কে বলিবে?

## ২৩

যেদিন শরৎ বাঁকীপুর হইতে টেলিগ্রাম পাইলেন, সেই দিন অপরাহ্নকালে রাজেন্দ্র মিঃ রের বাটীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অন্যান্য আলাপের পর রাজেন্দ্র বলিলেন,—

"দায়রার আদালতে কাল কেশবপ্রসাদের মামলা আরম্ভ হইবে। তাহার পিতা পুত্রের পক্ষ সমর্থনের জন্য কলিকাতা হইতে আমাদের শরৎকে আনাইতেছেন। আজ বাবু হরদৎ-লাল শরৎকে টেলিগ্রাম করিয়াছেন।"

মিঃ রে শুনিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—

"সত্য নাকি? কতদিন শরৎকে দেখি নাই। তাহাকে দেখিলে আমার স্ত্রী অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন। তাহাকে আমি এখনই সংবাদ দিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি উঠিবার উপক্রম করিলে রাজেন্দ্র বলিলেন "কিন্তু—"

"আবার কিন্তু কি?"

রাজেন্দ্র মাথা নিচু করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—

"শরৎ মিস রায়কে সেই একদিন মাত্র দেখিয়াছে। সে অত্যন্ত ভাবুক, একদিনের দর্শনের ফলেই কাহাকে কিছু না বলিয়া বিলাতে গেল। বিলাত হইতে আসিবার পর তাহার সহিত আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। তাহার মনের ভাব, মিস্ রায়ের সম্বন্ধে কিরূপ আছে, তাহা জানিতে পারিলে বোধ হয় ভাল হইত।"

মিঃ রায় রাজেন্দ্রের কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন—

"ঠিক কথা, শরৎ এখনও বেলার সম্বন্ধে পূর্ব্বভাব মনে পোষণ করে কিনা, তাহা জানা আবশ্যক। তুমি চেষ্টা করিলে বোধ হয় তাহার মনের ভাব অনায়াসে জানিতে পারিবে।"

মিঃ রে এখন আর রাজেন্দ্রকে "আপনা আপান" প্রভৃতি সম্ভ্রমসূচক সম্বোধন করেন না। তিনি রাজেন্দ্রকে এখন "ঘরের ছেলে" বলিয়া মনে করেন।

রাজেন্দ্র বলিলেন,

"আমি মনে মনে একটা মতলব করিয়াছি। তাহা কত দূর সফল হইবে, তাহা বলিতে পারি না। আপনি যদি বলেন, তবে আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।"

"কি মতলব করিয়াছ?"

"আমার ইচ্ছা শরৎ আসিলে, তাহাকে জানাইব না যে, আপনারা এখানে আছেন। সে বিলাত হইতে এবং বিলাত

থেকে আসিয়া আমাকে পত্র দিয়াছিল, তাহাতে আপনার ঠিকানা জানিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহাকে লিখিয়াছিলাম যে, আপনি অবকাশ লইয়া পশ্চিমে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আপনি যে বাঁকীপুরে আছেন একথা তাঁহাকে জানাই নাই। তাহার পর, বড় মা যে কাশী হইতে এখানে আসিয়া আমাদের বাসাতে আছেন, বাবা ও মা যে এখানে আসিয়াছেন, এসকল কথাও তাহার কাছে গোপন করিব। সে বাঁকীপুরে আসিলে আমিও তাহার সহিত দেখা করিব না। পরে তাহাকে কৌশল করিয়া এই বাটীতে আনাইয়া একেবারে মিস্ রায়কে তাহার কাছে লইয়া যাইব। মিস্ রায়কে দেখিয়া তাহার মনে কিরূপ ভাব হয়, তাহা দেখিব। আপনি কি বলেন?"

"মন্দ পরামর্শ নহে। কিন্তু শরৎ বাঁকিপুরে আসিয়া নিশ্চয়ই তোমার বাসাতে যাইবেন। তখন তোমার পিতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে। তুমি এই সাক্ষাৎ বন্ধ করিবে কিরূপে?"

"বাবু হরদৎলাল এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিতে পারেন।"

"দেখ বাবা, আমি এ সম্বন্ধে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করিব না। তুমি যেরূপ পরামর্শ দিবে সেই অনুসারেই কার্য্য করিব। যাহা হউক আমি শরতের সংবাদ গৃহিণীকে বলিয়া আসি।"

এই বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলে রাজেন্দ্র বলিলেন—"শরতের আগমনের সংবাদ মিস্ রায়কে জানাইবেন কি ?"

"তুমি কি বল ? এখন জানাইব না ?"

"আমার বোধ হয় এখন না জানাইলে ভাল হয়। কারণ তিনি ছেলে মানুষ।"

মিঃ রায় "আচ্ছা তাই ভাল" বলিয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন এবং প্রায় তিন চারি মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—

"গৃহিণী ত শরৎ আসিবেন শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়াছেন। আমি তাঁহাকেও বারণ করিয়া দিয়াছি যে, বেলার কাছে যেন কোন কথা প্রকাশ না করে।"

ইহার পর আরও প্রায় আধঘণ্টাকাল মিঃ রের সহিত নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিয়া রাজেন্দ্র তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং বাবু হরদৎলালের আবাসে গমন করিলেন। শরৎ বাঁকিপুরে আসিলে কোথায় তাঁহাকে আশ্রয় দেওয়া হইবে এবং কি ভাবে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে প্রভৃতি বিষয় বিবৃত করিয়া বলিলেন,—

"মিঃ রের ইচ্ছা এইরূপভাবে কার্য্য করা হউক।"

বৃদ্ধ হরদৎলাল হাসিয়া বলিলেন—

"ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের যখন এইরূপ আদেশ তখন তাহার উপর আর অন্য কথা কি আছে ? আপনি যাহা বলিবেন, সেইরূপই হইবে।"

হরদৎলালের নিকট হইতে বিদায় লইয়া রাজেন্দ্র স্বীয় আবাসে গমন করিলেন। এবং জনক-জননী ও বড়মাকে বলিলেন, "শরৎ কাল প্রাতেই বাঁকিপুরে আসিবেন, কিন্তু দুই এক দিনের জন্য তাহাকে অন্যত্র থাকিতে হইবে। সে বোধ হয় হরদৎলালের বাটীতে গিয়া উঠিবে তাহার পর আমি তাহাকে এখানে আনিব। মিঃ রে বলিলেন যে, কলিকাতা হাইকোর্ট হইতে নূতন ব্যারিষ্টার আসিয়া একজন উকিলের বাটীতে আশ্রয় লওটা ভাল দেখায় না। একটা পৃথক বাটীতে তাঁহার থাকাই ভাল। হরদৎলালের বাগান বাড়ীটা এজন্য আজ পরিষ্কার করা হইয়াছে।

রাজেন্দ্রের জননী শরৎকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেও উপযুক্ত পুত্রের প্রস্তাবে আপত্তি করা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে করিলেন না। তিনি কেবল একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কতদিন বাছাকে দেখিনি।"

## ২৪

ভোর বেলা পাঞ্জাব মেল বাঁকীপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হইবামাত্র অনেক আরোহী পোঁটলা পুঁটুলি বাক্স তোরঙ্গ প্রভৃতি লইয়া গাড়ী হইতে প্লাটফরমে অবতরণ করিল। সময়টা ফাল্গুন মাসের শেষ হইলেও তখন ভোরবেলা যেন শীত ছিল; বিশেষতঃ সে বৎসর শীত ঋতুটা কিছু অসম্ভব দীর্ঘ হইয়াছিল। ফাল্গুন মাসেও লোকে মাঘমাসের শীত অনুভব করিত।

ডাকগাড়ীর একখানা প্রথমশ্রেণীর কক্ষ হইতে ইউরোপীয় বেশধারী যুবক প্লাটফরমে অবতরণ করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক যেন কোন প্রিয়জনকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাহার সঙ্গে একটা চামড়ার প্রকাণ্ড পোর্টমেণ্ট ছিল। একজন কুলি ডাকিয়া তিনি সেটা তাহার মাথায় চাপাইয়া দিলেন এবং দ্বারদেশে টিকিট দিয়া প্লাটফরম হইতে বাহির হইলেন।

যুবক বাহিরে গমন করিবামাত্র একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক দ্রুত পদে তাঁহার নিকটে আসিয়া "শরৎ কেমন আছ বাবা?" বলিয়া তাঁহাকে একেবারে আলিঙ্গনে বাঁধিয়া ফেলিলেন।

শরৎ হরদৎ লালকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন "আপনি এই শীতে আসিয়াছেন? আপনি এই প্রাচীন শরীর লইয়া হিমে আসিয়া ভাল করেন নাই? আপনার বাটীর সমস্ত সংবাদ মঙ্গল? আমি ভাল আছি।"

এই বলিতে বলিতে অবনত হইয়া পিতৃতুল্য পূজনীয় বৃদ্ধের পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

হরদৎলাল কুশল সমাচারাদির পর বলিলেন, "আমার সঙ্গে আমার বাটীতেই চল, সেইখানেই তোমার থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।"

এমন সময় একজন শীর্ণকায় যুবক তাড়াতাড়ি তাঁহাদের নিকটে আসিয়া প্রথমে শরৎকে ও পরে হরদৎ লালকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—

"আমাকে মাফ করবেন। আমার আসিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, আমি তাই ছুটে ছুটে আসছি।"

শরৎ এই অপরিচিত যুবকের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র হরদৎলাল বলিলেন—

"ইনি রাজেন্দ্র বাবুর মুহুরী।"

মুহুরী বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, আমি উকীল বাবুর মুহুরী। তিনি নিজেই ষ্টেশনে আপনাকে নিতে আসবেন এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু কাল বৈকালে একখানা তার পেয়ে তিনি গয়াতে চলে গেলেন। বোধ হয় কাল আসবেন। আমাকে বলে গিয়েছেন যে, একটা সঙ্গীন মামলার জন্য তাঁকে অন্যত্র যেতে হ'ল, আপনি কিছু মনে করবেন না।"

হরদৎ লাল বলিলেন—

"তা আর মনে করবেন কি? ইনি যেমন জরুরী তার পেয়ে কলিকাতা থেকে বাঁকিপুরে এসেছেন, সেইরূপ হয়ত জরুরী তার পেয়ে তাঁকেও যেতে হয়েছে। উকীল, ডাক্তার, ব্যারিষ্টার এঁদের কি এক স্থানে নিশ্চিন্ত হয়ে বসিবার যো আছে?"

এই বলিতে বলিতে হরদৎ লাল শরৎকে লইয়া একখানা অতি সুন্দর গাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইলে, সহিস সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া গাড়ীর দ্বার খুলিয়া দিল। হরদৎ লাল শরৎকে লইয়া গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক উপবেশন করিলে, সহিস সশব্দে গাড়ীর দ্বার বন্ধ করিল। কোচম্যান কুলির মাথা

হইতে পোর্টমেন্টটা লইয়া গাড়ীর ছাদে রাখিয়া দিল এবং বল্গা সঞ্চালন পূর্ব্বক ইঙ্গিত করিবামাত্র তেজস্বী অশ্বযুগল নৃত্যের ভঙ্গীতে তালে তালে পদক্ষেপ করিয়া দুলিতে দুলিতে অগ্রসর হইল। মুহুরী শরৎকে ও হরদৎ লালকে আবার নমস্কার করিয়া অন্য পথে চলিয়া গেল।

গাড়ীতে শরৎ অধিক কথা কহিলেন না। আজ কত কাল পরে তিনি বাঁকিপুরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সেই বাল্যকালের সুখময় স্মৃতি নিমেষ মধ্যে চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। এই সেই বাঁকিপুর—যেখানে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত কত সুখে কাটাইয়াছেন। এই তাঁহার সেই চির পরিচিত পল্লী—কিন্তু কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে! হরুয়া দোসাদের কুটীর যেখানে ছিল, সেখানে একটা সুন্দর দ্বিতল বাটী হইয়াছে। তাঁহার ক্রীড়া সহচর হরিধনের আবাস যেখানে ছিল সেই স্থানে একটা সুন্দর বাগান হইয়াছে। দূর হইতে শরৎ তাঁহার অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন—তাঁহার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুততর হইতে লাগিল। মনে পড়িল তাঁহার সেই স্নেহময় জনক জননীর মূর্ত্তি। জননীকে মনে পড়িবামাত্র তাঁহার নয়ন বাষ্পপূর্ণ হইল—তিনি একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন,

"রাজেন্দ্রের পিতা মাতা এখন কোথায়?"

হরদৎ লাল বলিলেন,

"কিছু দিনপূর্ব্বে এই খানেই ছিলেন দেখিয়াছিলাম!

ইদানীং কয়েক দিন দেখি নাই বোধ হয় আবার কোথাও গিয়া থাকিবেন। তাঁরা ত এখানে অধিক দিন থাকেন না, মধ্যে মধ্যে আসিয়া দুই একমাস থাকেন। ব্রজেন্দ্র বাবু বড় ভদ্রলোক।"

শরৎ এ কথায় কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহাদের গাড়ী যখন শরতের পৈতৃক অট্টালিকা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল, তখন শরৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,

"এ বাড়ী কি এখন ভাড়া আছে? কে ভাড়া লইয়াছেন?"

"ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব।"

"ম্যাজিষ্ট্রেট!" শব্দটি কর্ণগোচর হইবামাত্র শরৎ একটু স্তম্ভিত হইয়া উঠিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট! মিঃ রেও ত ম্যাজিষ্ট্রেট, কিন্তু তিনি নিশ্চিতই এখানে থাকেন না, থাকিলে রাজেন্দ্র তাহাকে সে সংবাদ দিতেন। মিঃ রে এখনও ছুটীতে আছেন—কিন্তু কোথায় আছেন?"

বাল্যস্মৃতি যৌবন স্মৃতিতে পরিণত হইল। ঘোড়া-গাছির সেই নদীর তীর—সেই বজরা—সেই সঙ্গীত—তার পর সেই সুন্দর মুখ—সেই দৃষ্টি—বেলা এখন কোথায়? সে কত বড় হইয়াছে? যদি এতদিনে তাহার বিবাহ হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে—

শরৎ আর ভাবিতে পারিলেন না। তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলেন। এমন সময় গাড়ী একটি বড় ফটক পার

হইয়া একটা অট্টালিকার গাড়ী-বারান্দার নিম্নে গিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ হরদৎ সস্নেহে শরতের হাত ধরিয়া বলিলেন,

"এস শরৎ!"

শরৎ সহসা যেন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া অপ্রতিভ হইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং পরক্ষণেই গাড়ী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক সবিস্ময়ে বলিলেন,

"এই আপনার বাড়ী? আমিত এ বাড়ী দেখি নাই।"

বৃদ্ধ সহাস্যে বলিলেন,

"এ বাড়ী তুমি দেখিবে কোথা হইতে। এটা আজ চারি বৎসর মাত্র হইয়াছে। সে পুরাতন বাড়ী ইহারই সংলগ্ন উত্তর দিকে। আমি এখনও সেই বাটীতেই বাস করি। তুমি এই বাগান বাড়ীতে থাকিবে। বাহিরের অনেক উকীল মোক্তার আসামী ফরিয়াদী সাক্ষী তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতে পারে, এখানে নির্জ্জনে তাহাদের সহিত কথা বার্ত্তার সুবিধা হইবে। এস ঐ দিক দিয়া বাটীর মধ্যে যাই। আচ্ছা আগে চল, মুখ হাত ধুয়ে চা খাবে—সমস্ত রাত্রি গাড়ীতে কষ্ট হয়েছে। একটু সুস্থ হয়ে ও বাড়ীতে যাইও। এখন চল তোমার ঘর দেখাইয়া দিই।"

এই বলিয়া তিনি শরৎকে লইয়া দ্বিতলে আরোহণ করিলেন।

২৫

সন্ধ্যার পর—আসামী কেশব প্রসাদ, তাহার পিতা মথুরা প্রসাদ, আসামীর উকীল এবং আরও তিন চারিজন ভদ্রলোক শরতের বসিবার কক্ষে বসিয়া শরতের সহিত মামলা মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে নানা প্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে ছিলেন।

উকীল বাবু বলিলেন—

"এই তিন খানি পত্রই আমাদের বিরুদ্ধে প্রধান প্রমাণ। কেশব প্রসাদ বলিতেছে যে ঐ পত্র তিন খানাই জাল, তাহার লেখা নহে, কিন্তু তাহার হস্তাক্ষরের সহিত ঐ পত্রের হস্তাক্ষরের এমন মিল আছে যে, যে দেখিবে সেই স্বীকার করিবে যে ইহা কেশবেরই হাতের লেখা! বিশেষতঃ কেশবের একজন পুরাতন বন্ধু রামভজন নিম্ন আদালতে হলফ করিয়া বলিয়াছে যে কেশব এই পত্রগুলি লিখিয়া তাহার হাত দিয়াই লছমনিয়ার কাছে পাঠাইয়া দিযাছিল। এই তিন খানি পত্র ছাড়া কেশবের বিরুদ্ধে যে সকল Circumstancial evidence আছে তাহাও বড় সামান্য নহে।"

কেশব করযোড়ে ম্লান মুখে বলিল,

"ধর্ম্মাবতার আমি কিছুই জানিনা, এ পত্রের লেখা ঠিক আমার লেখার মত সত্য, কিন্তু আমি এ পত্র লিখি নাই—এ পত্র জাল। শালা রাম ভজন নিমক হারাম।"

কেশবলাল শরৎকে "ধর্ম্মাবতার" বলিয়া সম্বোধন করাতে শরৎ বলিলেন,

"আমিত হাকিম নহি—আমি তোমার ব্যারিষ্টার। তোমার এই উকীল বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাঁহার সাহায্য লইয়া আমি তোমাকে বাঁচাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আমি ত রক্ষাকর্ত্তা নহি। রক্ষা কর্ত্তা ভগবান্।"

বৃদ্ধ মথুরাপ্রসাদ ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—

"ঠিক কথা। ভগবানই রক্ষাকর্ত্তা। যদি তোমার পাপ না থাকে তাহা হইলে ভগবান্ তোমাকে রক্ষা করিবেন। আর যদি তোমার পাপ থাকে, তবে ভগবান্ তার শাস্তি নিশ্চয়ই দিবেন। তাঁহার কাছে অবিচার নাই।"

শরতের সহিত উকীল বাবু অনেক কথাবার্ত্তা কহিলেন। তাঁহাদের কথোপকথন ইংরাজীতে হইতেছিল বলিয়া মথুরা-প্রসাদ, কেশবপ্রসাদ প্রভৃতি তাহার বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে পারিল না। আংরেজি জবান তাহারা সমঝাইত না। যতক্ষণ শরৎ কথা কহেন, ততক্ষণ কেশব আশাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকে। আবার যখন উকীল বাবু কথা কহেন, তখন সে এক দৃষ্টিতে তাঁহার মুখে নিজের ভাগ্য-লিপি পাঠ করিতে চেষ্টা করে।

শরৎ অন্যমনস্ক ভাবে মামলার কাগজপত্র উল্টাইতে উল্টাইতে ইংরাজী ভাষাতে উকীল বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"আসামীর অপরাধ সম্বন্ধে আপনার নিজের ধারণা কি?"

উকীল বাবু বলিলেন—

"আসামী লম্পট ও মাতাল সত্য, কিন্তু সে যে নরহত্যা

করিতে পারিবে তাহা আমার মনে হয় না। কারণ নরহত্যা করিবার মত সাহস তাহার নাই। বিশেষতঃ অলঙ্কার চুরির ব্যাপারটা আগা-গোড়াই রহস্যাবৃত। কেশব প্রসাদ সেই বারবনিতার জন্য অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছে, সুতরাং সে যে অলঙ্কারের লোভে খুন করিবে তাহা হইতেই পারে না। সে পিতার একমাত্র সন্তান তাহার অর্থের অভাব নাই।"

শরৎ বলিলেন—

"আমারও ধারণা যে আসামীর বিরুদ্ধে একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্র হইয়াছে। নির্ব্বোধ কেশব প্রসাদ সে ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারে নাই। তাহারই কোন কোন বন্ধুরূপী শত্রু যেমন রাম-ভজন—সেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। তাহারাই কেশবপ্রসাদের প্রধান শত্রু।"

"আমিও আপনার মতের সমর্থন করি। কিন্তু এই পত্র তিন খানা?"

"মূল পত্র বোধ হয় নথিভুক্ত হইয়া আছে। আজ আদালতে তাহা ভাল করিয়া দেখিবার সময় পাই নাই। কাল একবার ভাল করিয়া দেখিব।"

"আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, উহা জাল বলিয়া কিছুতেই মনে হয় না। আমি অনুবীক্ষণের সাহায্য লইয়াও পরীক্ষা করিয়াছি।"

শরৎ হতাশ হইয়া বলিলেন—

"উহা জাল প্রমান না করিতে পারিলে আমাদের সকল

কার্য্যই ব্যর্থ হইবে। সাক্ষীকে জেরা করিলে না হয় দুই এক-জনের মিথ্যা কথা ধরা পড়িবে মাত্র, কিন্তু পত্রকে ত জেরা করা চলিবে না। উহারা এক কথাই বলিবে।"

মামলা সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলোচনার পর উকীল বাবু, মথুরাপ্রসাদ, কেশবপ্রসাদ প্রভৃতি বিদায় গ্রহণ করিলে শরৎ হরদৎলালের অন্তঃপুরে আহারার্থে প্রবেশ করিলেন। হরদৎ-লাল শরতের জন্য একটা সাহেবি হোটেল হইতে খানা আনা-ইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু শরৎ তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন—

"বিদেশে বাধ্য হইয়া খানা খাইতে হইয়াছিল, সে জন্য যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি। এখন ঘরের ছেলে আপনাদের কাছে ফিরিয়া আসিয়াছি, আর খানা খাইব কেন?"

বৃদ্ধ শরতের কথা শুনিয়া, হোটেলের খানা ফেলিয়া দিলেন এবং নিজের বাটীতেই তাঁহার আহারের বন্দোবস্ত করিলেন।

## ২৬

আজ খুনি মামলার শেষ দিন। সরকার পক্ষের সমস্ত সাক্ষীর জবানবন্দী হইয়া গিয়াছে। শরৎ কোন সাক্ষীকে জেরা করেন নাই। আসামীর উকীল যখন শরৎকে, সাক্ষী দিগকে জেরা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন শরৎ বলিলেন—

"জেরা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। পরে যদি আবশ্যক বোধ হয়, জেরা করিব।"

সরকার পক্ষে সকল প্রকারে প্রায় ৩০ জন সাক্ষী ছিল। তাহাদের এজেহার শুনিয়া—কেশবপ্রসাদ যে সত্য সত্যই অপরাধী, সেই যে লছমনিয়াকে হত্যা করিয়াছে, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। দুই চারিজন সাক্ষীর মিথ্যা কথা অনায়াসে বুঝিতে পারা গেল, কিন্তু শরৎ তাহাদিগকে জেরা করিয়া সেই মিথ্যা প্রমাণ করিলেন না।

মামলার দ্বিতীয় দিন হইতে, আদালতে শরতের অদ্ভুত ভাবপরিবর্ত্তন দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। সরকার পক্ষের সাক্ষীরা যতক্ষণ এজেহার দিতে লাগিল ততক্ষণ শরৎ মামলার কাগজপত্র লইয়া তন্ময় হইয়া বসিয়া থাকিতেন। কোন্ সাক্ষী কি বলিতেছে, কাহার কথা অন্যের উক্তির সহিত মিলিতেছে বা মিলিতেছে না, সে দিকে আদৌ লক্ষ্য করিতেন না। তাঁহার এইরূপ ঔদাস্য দেখিয়া মথুরাপ্রসাদ মনে করিতেন, কতকগুলা টাকা বরবাদ গেল।

এই মামলাতে যিনি সরকার পক্ষের উকীল ছিলেন, তিনি শরতের পিতা বসন্ত বাবুর সমসাময়িক এবং তাঁহার বন্ধু ছিলেন। সেইজন্য শরৎ বিলাত ফেরৎ এবং কলিকাতা হাইকোর্টের উদীয়মান ব্যারিষ্টার হইলেও তিনি শরৎকে গ্রাহ্য করিতেন না। বরং অনেক সময় মুরব্বিয়ানা চালে কথাবার্ত্তা কহিতেন। শরৎ জানিতেন, তিনি পিতার বন্ধু সুতরাং পিতৃতুল্য, তাঁহার ব্যবহারে ত্রুটী ধরা সঙ্গত নহে।

সরকার পক্ষের সমস্ত সাক্ষীর জেরা শেষ হইলে জজ সাহেব শরতকে বলিলেন—

"আপনি এই সকল সাক্ষীকে জেরা করিবেন না?"

শরৎ সবিনয়ে উত্তর দিলেন—

"নিষ্প্রয়োজন। অকারণে আদালতের সময় নষ্ট করিয়া এবং আসামী বেচারার টাকা খরচ করাইয়া লাভ কি? এত-গুলি সাক্ষীকে জেরা করিতেও ৪।৫ দিন লাগিবে। এই চার পাঁচ দিন অনর্থক নষ্ট করিয়া লাভ কি?"

জজ সাহেব বলিলেন—

"তাহা হইলে কি আপনি অপরাধ স্বীকার করিবেন?"

"শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অপরাধ স্বীকার করিব না।"

জজ সাহেব সহাস্যে বলিলেন—

"তবে সরকার পক্ষের উকীল তাঁহার বক্তৃতা করিতে পারেন?"

শরৎ বলিলেন—

"নিশ্চয়ই। তাঁহার যাহা বক্তব্য আছে, তিনি বলিতে পারেন।"

তখন উকীল সরকার পক্ষ হইতে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তিনি এক একজন সাক্ষীর এজেহার লইয়া বিধিমত প্রকারে কেশব প্রসাদের অপরাধ সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিলেন। সেই তিন খানি পত্রের উল্লেখ করিয়া তিনি যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিলেন, মনোবিজ্ঞান ও দার্শনিক তত্ত্বের মধ্য দিয়া তিনি

কেশবপ্রসাদের নৈতিক অবনতি সম্বন্ধে যেরূপ বক্তৃতা করিলেন তাহা শ্রবণে সকলেই বুঝিলেন, যে হতভাগ্য কেশবের যদি প্রাণদণ্ড নাও হয়, তথাপি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস অনিবার্য্য।

সরকার পক্ষের উকীল প্রায় একঘণ্টা কাল ধরিয়া নানা প্রকার যুক্তি তর্ক এবং রাজ বিধানের সাহায্যে কেশবপ্রসাদের অপরাধ সপ্রমাণ করিয়া জুরীদিগকে বলিলেন—

"আসামীর যে তিনখানি পত্র আদালতে দাখিল হইয়াছে, কেবল সেই তিনখানি পত্র পাঠ করিলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে আসামী কিরূপ ভীষণ প্রকৃতির লোক, সে হতভাগিনী লছমনিয়াকে হত্যা করিবার জন্ত কত পূর্ব্ব হইতে মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিল। সে সন্দেহের বা ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া সহসা লছমনিয়াকে খুন করে নাই। আসামীর ব্যারিষ্টার মহাশয়ও ইহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন বলিয়াই যে, আমাদের সাক্ষীকে জেরা করা অনাবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। তিনি জেরা করিয়া আমাদের সাক্ষীদিগকে বিভ্রান্ত করিতে পারিতেন, হয়ত তাহাদের কোন কোন উক্তিকে অসত্য বলিয়াও প্রমাণ করিতে পারিতেন, কিন্তু এই তিন খানি পত্রকে ত তিনি জেরা করিয়া মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন না। ভদ্র মহোদয়গণ, আপনারা এই মামলার আদ্যোপান্ত অবগত হইয়াছেন। এখন এই নর-হত্যাকারীর অপরাধ সম্বন্ধে আপনাদের অভিমত ব্যক্ত করুন।"

এই বলিয়া উকীল মহাশয় শরতের প্রতি একটা অবজ্ঞা-পূর্ণ কটাক্ষপাত করিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার ওষ্ঠ-প্রান্তে হাস্যরেখা দেখিয়া আসামী কেশবপ্রসাদের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল।

সরকার পক্ষের উকীল উপবেশন করিলে, শরৎ দণ্ডায়-মান হইয়া জুরীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"ভদ্র মহোদয়গণ সরকার পক্ষের উকীল যথার্থই বলিয়া-ছেন যে, সাক্ষীদিগকে জেরা করিলে সকলেরই মিথ্যা কথা সপ্রমাণ হইতে পারে। আমিও সেই জন্যই তাহাদিগকে জেরা করিয়া আদালতের বহুমূল্য সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি নাই। এখন কথা হইতেছে এই তিন খানি পত্র সত্য কি মিথ্যা। ইহার সত্য মিথ্যা আপনারাই নির্ণয় করুন।"

এই বলিয়া শরৎ সেই তিনখানি পত্র তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার এই পত্র তিন খানির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। পত্রগুলি ১৩০৮ সালে অর্থাৎ ইংরাজী ১৯০১ এবং ১৯০২ খৃষ্টাব্দে লিখিত। শেষ পত্রখানি ১৩০৮ সালের ফাল্গুন মাসে লিখিত; সুতরাং উহা ইংরাজী ১৯০২ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছে। অপর দুই খানি ১৯০১ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। আমাদের বাঙ্গালা দেশে একটা জনপ্রবাদ আছে যে মহর্ষি বাল্মীকি, শ্রীরামচন্দ্রের জন্মের বহু পূর্ব্বে রাম-চরিত রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি ত্রেতাযুগের লোক। হয়ত তিনি ত্রেতাযুগের

আবির্ভাবের পূর্ব্বে সত্য যুগেই রামায়ণ রচনা করিয়া থাকিবেন। আপনারা মনে করিবেন না যে, ত্রেতাযুগে যাহা সম্ভব ছিল, তাহা এই কলিযুগে একেবারে অসম্ভব। এই পত্র তিন খানা যে সময় লিখিত হইয়াছিল, অর্থাৎ ১৯০১ বা ১৯০২ খৃষ্টাব্দে এই পত্রের কাগজ জন্মগ্রহণ করে নাই। আপনারা পত্রগুলি আলোকে ধরিলেই সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যে, কাগজে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ জলের অক্ষরে লেখা আছে ১৯০৭। অর্থাৎ যে বৎসরে এই কাগজ প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই বৎসর এই কাগজে লেখা আছে। আপনারা তিন খানি কাগজেই এই বৎসরের দাগ দেখিতে পাইবেন। আমার উক্তির সমর্থনের জন্য আমি কল্য বাজার হইতে অনেকগুলি চিঠির কাগজ কিনিয়া আনিয়াছি। এই পত্র তিনখানি যেরূপ কাগজে লিখিত আমি সেইরূপ কাগজই ক্রয় করিয়াছি। একই কোম্পানির প্রস্তুত কাগজ। এই সকল কাগজ আলোকে ধরিয়া দেখুন—কোনটাতে ১৯০৯, কোনটাতে ১৯০৮, আবার কোনটাতে ১৯১০ জলের অক্ষরে লেখা রহিয়াছে। সুতরাং এই পত্র তিনখানির কাগজও যে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে বা যাহারা এই তিনখানি পত্র লিখিয়াছে, সে বা তাহারা পরের অক্ষর অনুকরণ করিয়া লিখিতে সিদ্ধহস্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। রসায়ণ শাস্ত্রের সাহায্যে নূতন কাগজের বর্ণ অতি পুরাতন কাগজের ন্যায় করা যাইতে পারে।

যে আসামীর হস্তাক্ষর জাল করিয়াছে সে পাকা জালিয়াৎ হইলেও এক বিষয়ে বড়ই কাঁচা, বড়ই আহম্মকের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে। কাগজের ভিতরে যে উহার জন্ম তারিখ লেখা আছে, তাহা সে দেখে নাই। আমার আর কিছুই বক্তব্য নাই। উকীল সরকারের প্রধান সাক্ষী এই তিনখানি পত্র কতদূর সত্যবাদী এবং আমার বিরুদ্ধে কিরূপ ভীষণ ষড়যন্ত্র হইয়াছে, তাহা আপনারাই বিচার করুন।"

এই বলিয়া শরৎ উপবেশন করিলেন। জুরীরা পত্র তিনখানি লইয়া আলোকে ধরিয়া দেখিলেন, সত্য সত্যই উহার কাগজে ইংরাজীতে ১৯০৭ লেখা আছে। তাহারা শরতের আনীত নূতন চিঠির কাগজ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাহার মধ্যেও ঐরূপ তারিখ লেখা রহিয়াছে। জজ সাহেবও ইহা পরীক্ষা করিলেন, আদালত গৃহে সমবেত জনতা একেবারে নীরব নিস্তব্ধ। সকলেই অতি মাত্রায় বিস্মিত।

জজ সাহেব সংক্ষেপে জুরীদিগকে মোকদ্দমার বিবরণ বুঝাইয়া দিলে তাঁহারা কক্ষান্তরে গমন করিলেন, এবং দুই চারি মিনিট পরে আদালত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহাদের মুখপাত্র বলিলেন,—

"আমরা সকলে এক মত হইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে আসামী কেশব প্রসাদ নিরপরাধ। সে হত্যাকারী নহে। তাহার বিরুদ্ধে একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। সেই ষড়যন্ত্রের ফলেই কেশবপ্রসাদ আজ হত্যাভিযোগে অভিযুক্ত।"

জজ সাহেব জুরীদিগের সহিত একমত হইয়া আসামীকে নিরপরাধ স্থির করিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি প্রদান করিলেন। এজলাস ভাঙ্গিয়া গেল। শত শত কণ্ঠে শরতের, জজ সাহেবের এবং কোম্পানি বাহাদুরের জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। এজলাসের বাহিরে আসিবামাত্র শরৎকে বৃদ্ধ মথুরাপ্রসাদ জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শরৎ অতিকষ্টে বৃদ্ধের আলিঙ্গন মুক্ত হইয়া হরদৎলালের সহিত মোটরে আরোহণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

## ২৭

সেইদিন সন্ধ্যার পর শরৎ হরদৎলালকে বলিলেন,—

"আপনার আশীর্ব্বাদে আমার কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে। কেশবপ্রসাদ মুক্তি পাইল। আর আমি এখানে বসিয়া কি করিব? রাজেন্দ্র যে কবে আসিবে তাহার স্থিরতা নাই। তাহার সেই মুহুরী আজ সকালে বলিল, যে রাজেন্দ্র দুই চারি দিন পরে আসিবে। সুতরাং তাহার জন্য অনির্দ্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করিয়া থাকা কি ভাল? আমার ইচ্ছা যে কালই আমি কলিকাতায় ফিরিয়া যাই।"

হরদৎলাল বলিলেন,—

"রাজেন্দ্র বাবুর আগমনের অপেক্ষায় তোমাকে বসিয়া থাকিতে বলি না। কলিকাতায় না যাইলে যদি কাজের ক্ষতি হয়, তবে অবিলম্বে যাওয়াই উচিত। কিন্তু কাল তোমার

যাওয়া হইবে না। বাবু মথুরাপ্রসাদ কাল সন্ধ্যার পর তোমার সংবর্দ্ধনার আয়োজন করিতেছেন। তিনি বাঁকীপুরের কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোককেও তোমার সহিত আলাপ পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে চক্রবর্ত্তী সাহেবকে না হয় ফি দিয়া আরও একদিন এখানে আটক করিয়া রাখিবেন।"

শরৎ হাসিয়া বলিলেন,"মামলা মিটিয়া গেল আবার ফি কেন? ব্যারিষ্টারকে নিমন্ত্রণ করিলে ফি দিতে হয় না। যদি আপনি কাল থাকিয়া যাওয়া আবশ্যক মনে করেন, তাহা হইলে কাল থাকিয়া পরশু যাইব।"

"এই একটা মামলায় বাঁকীপুরে তোমার বেশ যশঃ ও খ্যাতি হইয়াছে। ভবিষ্যতে এখানে তোমার বেশ পসার হইবার সম্ভাবনা। যদি এখন হইতে কয়েকজন ভদ্রলোকের সহিত আলাপ পরিচয় হয়, তাহাতে লাভ বই লোকসান নাই। আর কাল এখানে থাকিলে হয়ত রাজেন্দ্র বাবুর সঙ্গেও দেখা হইতে পারে।"

"এ যাত্রায় যে রাজেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইবে আমি সে আশা করি না। তবে কাল যখন অনেকগুলি ভদ্রলোক আমার সহিত আলাপ পরিচয় করিবেন বলিতেছেন, তখন আমি কাল আর যাইব না।"

শরতের কথায় হরদৎলাল সন্তুষ্ট হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। শরৎ একখানা সংবাদ পত্র লইয়া বসিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে বাবু মথুরাপ্রসাদ, কেশবপ্রসাদ এবং আরও পাঁচ সাতজন ভদ্রলোক হরদৎলালের বাটীতে শরতের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। পূর্ব্ব দিন আদালতে জজ সাহেব রায় প্রকাশ করিবার অব্যবহিত পরেই শরৎ আদালত হইতে চলিয়া আসাতে বাবু মথুরাপ্রসাদ যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার অবসর পান নাই। সেইজন্য তিনি পরদিন প্রাতঃকালে কয়েকজন আত্মীয় বন্ধু এবং পুত্রকে সঙ্গে লইয়া শরতের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আসিলেন।

মিঃ রে বিলাত ফেরৎ হইলেও বাটীতে খাঁটী বাঙ্গালী হইয়া থাকিতেন। শরৎও আদালতে যাইবার সময় সাহেবী পোষাক পরিয়া যাইতেন, বাটীতে আসিয়া সাহেবী পোষাক ছাড়িয়া পূরা বাঙ্গালী হইয়াই থাকিতেন। সেইজন্য মথুরাপ্রসাদ প্রভৃতি হরদৎ লালের বাটীতে আসিয়া প্রথম দিনে শরৎকে প্রথমে চিনিতে পারেন নাই। তাঁহারা বাটীতে ও শরৎকে সাহেব-সাজে সজ্জিত দেখিবেন মনে করিয়াছিলেন কিন্তু দেখিলেন একখানা সাদা ধুতি পরিয়া একটা গায়ে গেঞ্জি দিয়া এবং একজোড়া চটি জুতা পায়ে দিয়া চক্রবর্ত্তী বসিয়া আছেন এবং হরদৎ লালের একটি আড়াই বৎসর বয়স্ক পৌত্র তাঁহার পিঠের উপরে পড়িয়া দুই হাত দিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আধ আধ স্বরে একটা 'ছড়া' বলিতেছে। এই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া আগন্তুকগণ বিস্মিত হইলেন।

বাবু মথুরাপ্রসাদকে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই

শরৎ সহাস্য-বদনে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। মথুরাপ্রসাদ শরতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সূচনা করিবামাত্র শরৎ সে কথা চাপা দিয়া অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। যতবার মথুরাপ্রসাদ ধন্যবাদ করিবার বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা করিলেন, ততবারই শরৎ সে কথা চাপা দিয়া অন্য কথার অবতারণা করাতে বৃদ্ধ মথুরাপ্রসাদ বুঝিতে পারিলেন যে, শরৎ আত্মপ্রশংসা শ্রবণ করিতে চাহেন না। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন।

বাবু মথুরাপ্রসাদ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিবার পরই শরৎ সেই শিশুকে বলিলেন—

"তোমার দাদাজীকে ডাকিয়া আন, বল যে অনেকগুলি বাবু দেখা করিতে আসিয়াছেন।"

শরৎ মথুরাপ্রসাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, এমন সময় হরদৎলাল পৌত্রকে কোলে করিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সকলকে সংবর্দ্ধনা করিয়া কেশবপ্রসাদকে মৃদু-মধুর তিরস্কার করিলেন। কুসংসর্গে থাকার পরিণাম যে কিরূপ ভয়াবহ, তাহাতে যে প্রাণ লইয়াও টানাটানি হইতে পারে, তাহা বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিলেন।

শরৎও হরদৎলালের কথার সমর্থন করিয়া বলিলেন—

"আজ আপনারা আমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন। যদি এই মামলাতে কেশবপ্রসাদের চরিত্র

সংশোধন হয়, তাহা হইলেই আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিব এবং আপনাকে ধন্য মনে করিব। একজন লোকের জীবন রক্ষা করা অপেক্ষা, এক ব্যক্তিকে অসৎপথ হইতে সৎপথে আনয়ন করাকে আমি প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি।”

শরতের কথায় কেশবপ্রসাদ লজ্জিত হইয়া বলিল—

“আপনারা আমাকে আর তিরস্কার করিবেন না। আমি আপনাদের সকলের সম্মুখে শপথ করিয়া বলিতেছি যে ভবিষ্যতে আমি আমার পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্যই করিব না এবং তাঁহার বিষয় কার্য্য দেখিব। যে কেশব-প্রসাদের জীবন রক্ষা করিতে আপনি কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন, সে কেশবপ্রসাদ মরিয়া গিয়াছে, তাহার ফাঁসি হইয়া গিয়াছে, আপনারা আজ হইতে নূতন কেশব প্রসাদকে দেখিতে পাইবেন। সেই পুরাতন কেশবপ্রসাদ মরিয়া নব-জন্ম লাভ করিয়াছে!”

পুত্রের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ মথুরাপ্রসাদ আনন্দাশ্রু মোচন করিলেন। এবং ধীরে ধীরে জামার পকেট হইতে একটা বহুমুল্য হীরকাঙ্গুরীয় বাহির করিয়া শরতের অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিতে দিতে বলিলেন—

“বাবু এই আংটি, আমার স্ত্রী—কেশবের মাতা আপ-নাকে উপহার দিয়াছেন, তিনি বলিয়াদিয়াছেন যে, এই আংটি আপনার স্ত্রীকে দিবেন।”

শরৎ হাসিয়া বলিলেন—

"তাঁহার প্রদত্ত উপহার আমার শিরোধার্য্য—যখন আমার স্ত্রী হইবে তখন তাহাকে দিব।"

মথুরাপ্রসাদ বলিলেন—

"আপনার কি এখনও বিবাহ হয় নাই?"

শরৎ বলিলেন—

"বিবাহের ফুল এখনও ফোটে নাই, যখন ফুটিবে তখনই বিবাহ হইবে।"

এই বলিয়া অন্যের অলক্ষে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। অনন্তর হরদৎলাল বলিলেন—

"আজ রাত্রিতে শরতের সহিত এখানকার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আলাপ পরিচয় করিবার ব্যবস্থা করা হই-তেছে, তাহা আপনারা জানেন। সন্ধ্যার পর যেন আপনা-দের সাক্ষাৎ পাই।"

সভা ভঙ্গ হইল, আগন্তুকগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে পর, হরদৎলাল শরৎকে বলিলেন—

"ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তোমার মামলার ফল দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। আজ প্রাতঃকালে আমি কোন কার্য্যানুরোধে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি কথায় কথায় তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করাতে আমি বলিলাম, 'হুজুর যদি অনুমতি করেন তবে আমি চক্রবর্ত্তী সাহেবকে আপনার নিকট পরিচিত করিয়া দিই। চক্রবর্ত্তী সাহেব

আমার বন্ধুর পুত্র, আমার পুত্রতুল্য। আমার কথা শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট হাসিয়া বলিলেন, তিনি আমার বাড়ীওয়ালা, তাঁহার সহিত আমার আলাপ পরিচয় থাকা ভাল। সন্ধ্যার পর আমি তাঁহার জন্য বাটীতে অপেক্ষা করিব এবং তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিতে পাইলে সুখী হইব।' আমার মতে একবার—তাঁহার সহিত দেখা করিলে ভাল হয় না ?"

শরৎ বলিলেন—

"আপনি যাহা বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহার উপরে আর আমার কথা কি ?"

"তবে এই বন্দোবস্তই রহিল, সন্ধ্যার পর একত্র ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কুঠীতে—যাওয়া যাইবে।

## ২৮

সন্ধ্যার একটু পরে হরদৎলাল শরৎকে বলিলেন—

"কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য আমি এখন বাহিরে যাইতেছি। ঠিক আটটার সময় আমি ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কুঠীতে যাইব এবং তোমার জন্য অপেক্ষা করিব। তুমি ঠিক আটটার সময় আমার মোটার লইয়া যাইও। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠী হইতে পরে একত্র বাগানে যাইব।"

সন্ধ্যার সময় মেঘ করিয়াছিল, সাড়ে সাতটার সময় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আটটার সময় শরৎ হরদৎলালের মোটারে আরোহণ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে তখন কত চিন্তার তরঙ্গ উঠিয়া

আবার বিলীন হইতেছিল কে বলিবে? তাঁহারই বাটী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ভাড়া লইয়াছেন। যে বাড়ীতে শরতের শৈশব ও কৈশোর কাল অতিবাহিত হইয়াছে, যেখানে তিনি পিতার ক্রোড়ে উঠিয়া পুষ্পোদ্যানে বেড়াইতেন, জননীর ক্রোড়ে শুইয়া চাঁদ ডাকিতেন, যে বাটীর প্রত্যেক ইষ্টক খণ্ডের সহিত তাঁহার বাল্যস্মৃতি বিজড়িত—সর্ব্বোপরি যে বাটীতে তাঁহার সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ জনক জননী অন্তিম শয্যায় শয়ন করিয়া ইহলোক হইতে চির বিদায় লইয়াছিলেন—সেই বাটীতে আজ তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন। যে কক্ষে বসিয়া তিনি বাল্যকালে পাঠাভ্যাস করিতেন, হয় ত সেই কক্ষে আজ তাঁহাকে প্রবেশ করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের চাপরাসীর অনুমতি লইতে হইবে!

শরতের হৃদয় এক অভূতপূর্ব্বভাবে পরিপূর্ণ হইল। তাঁহার মনে হইল, তিনি আজ সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র তীর্থদর্শনে যাইতেছেন, কিন্তু সেই তীর্থ আজ বিধর্ম্মীর করতলগত। যে কক্ষে তাঁহার জনক জননীর চিত্র বিলম্বিত ছিল, হয়ত সেই কক্ষে আজ দেখিবেন—বিলাতীছবি—একটা পাহাড় কি একটা সমুদ্রের চিত্র। হায় কি পরিবর্ত্তন!

শরৎ এইরূপে চিন্তা স্রোতে নিমগ্ন ছিলেন, বৃষ্টির মধ্য দিয়া কখন যে তাঁহার মোটার ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠীর গাড়ী-বারান্দার নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা তিনি

জানিতে পারেন নাই। গাড়ীর দ্বারোদ্ঘাটন-শব্দে তাঁহার চিন্তাস্রোত বাধা পাইল, তিনি সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন, এবং গাড়ী হইতে অবতরণ করিবার পূর্ব্বেই, দ্বারোদ্ঘাটন-কারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

"বাবু হরদৎলাল এখানে আসিয়াছেন ?"

উত্তর হইল,—

"না হুজুর, চক্রবর্ত্তী সাহেবের সঙ্গে আসিবেন।"

গাড়ীবারান্দার নিম্নে একটি লণ্ঠন মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল, তাহারই ক্ষীণ আলোকে শরৎ দেখিলেন, একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক মোটারের দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র শরৎ চিৎকার করিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন,

"রাজেন্দ্র! তুমি? তুমি কখন আসিলে ?"

রাজেন্দ্র বিদ্রূপের স্বরে কহিলেন,

"হাঁ হুজুর আমার নাম রাজেন্দ্রই বটে—হুজুরের ন্যায় আমিও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি।"

শরৎ গাড়ী হইতে বাহির হইয়াই রাজেন্দ্রকে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিলেন। রাজেন্দ্র বলিলেন,

"এটা যে সম্পূর্ণ দেশী কায়দা হইল, তোমাদের বিলাতী কায়দাটা কিরূপ একটু নমুনা দেখাও না।"

"আবার জেঠামি? এখন বল তুমি কবে আসিলে। আমি যে এখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে আসিব, তাহা

তুমি কিরূপে জানিলে? মা, বাবা কেমন আছেন? কোথায় আছেন?—"

রাজেন্দ্র বাধা দিয়া বলিলেন,

"অতগুলা প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া আমার কাজ নহে। এখন চল আগে সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসি। তার পর তোমার সব কথার জবাব দিব।"

"কিন্তু বাবু হরদৎলাল ত এখনও আসেন নাই, তিনিই ত আমাকে সাহেবের সহিত পরিচিত করিয়া দিবেন।"

রাজেন্দ্র বলিলেন,

"আমিও সাহেবের নিকটে একেবারে অপরিচিত নই, তাঁর এজলাসে আমাকে হামেসা যেতে হয়। আমিই না হয় তোমাকে তাঁর কাছে পরিচিত করে দিব।"

কথা কহিতে কহিতে রাজেন্দ্র শরৎকে লইয়া দ্বিতলের হলঘরে গমন করিলেন। শরৎ হলে প্রবেশ করিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন ততবড় সুসজ্জিত হলঘরের এক কোনে একটিমাত্র ল্যাম্প ক্ষীণ আলোক বিস্তার করিয়া হলের অন্ধকারনাশের জন্য বৃথা চেষ্টা করিতেছে। হলটিতে অনেক গুলি গদি আঁটা চেয়ার, সোফা, কৌচ, এবং মর্ম্মরপ্রস্তরের টেবিল রহিয়াছে। গৃহসজ্জার কোন ত্রুটী নাই—কিন্তু সেখানে একটিও লোক নাই।

হলের এক প্রান্তে একখানা কৌচের উপরে উভয়ে উপবেশন করিলে, শরৎ বলিলেন,

"সাহেব কোথায়? আর এই হলে আলো নাই কেন? সাহেবেরা ত আমাদের মত অন্ধকারে থাকিতে ভাল বাসেন না।"

"না, তাঁরা আলো পেয়েছেন কি না, আর আমরা অন্ধকারের জীব। তাই পাদ্রিসাহেবেরা আমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। ও কথা থাক, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এখনি আসিয়া পড়িবেন। সাহেবের একটা বড় সুন্দর ব্যবস্থা আছে, কোন ভদ্রলোক তাঁহার বাটীতে দিনমানে আসিলে তিনি লাইব্রেরিতে তাঁর অভ্যর্থনা করেন। সাহেবের আসিতে একটু বিলম্ব হইলে আগন্তুক ভদ্রলোক লাইব্রেরীতে বসিয়া সংবাদ-পত্র পাঠ করিতে পারেন। আর সন্ধ্যার পর কোন ভদ্রলোক আসিলে এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আসিতে কিছু বিলম্ব হইলে একজন গায়িকা গান গাহিয়া আগন্তুকের মনোরঞ্জন করে। এজন্য ম্যাজিষ্ট্রেট বেতন দিয়া একজন গায়িকাকে নিযুক্ত করেছেন। তুমি গান শুনবে?"

রাজেন্দ্রের কথা শরতের কাছে যেন প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইল। রাজেন্দ্র কি পাগল হইয়াছে নাকি? বাবু হরদৎলাল এখনও আসিলেন না কেন? ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও তাঁহার সহিত দেখা করিবেন বলিয়া বাটীতে ডাকাইয়া আনিয়া দেখা করিতেছেন না কেন? ব্যাপার কি? এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি রাজেন্দ্রের মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। রাজেন্দ্র বন্ধুকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিলেন,

"বুঝেছি মৌনং সম্মতিলক্ষণম্। গায়িকা ঠাকরোন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার বন্ধুকে একটা গান শুনাইবেন কি?"

রাজেন্দ্রের কথা শেষ হইবামাত্র সেই হলঘরের অন্য প্রান্ত হইতে হারমোনিয়মের সুমধুর ধ্বনি উত্থিত হইল। শরৎ সবিস্ময়ে সেই দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া দেখিলেন, টেবিল হার্ম্মোনিয়মের নিকটে একটি রমণী তাঁহাদের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া স্থির অচঞ্চল ভাবে বসিয়া আছেন। নানা-প্রকার গৃহ সজ্জার মধ্যে থাকাতে এবং হলের আলোক স্তিমিত হওয়াতে শরৎ তাহাকে প্রথমে দেখিতে পান নাই। হারমো-নিয়মের ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কিন্নরীকণ্ঠ-বিনিন্দিত সুমধুর সঙ্গীত-ধ্বনিতে সেই হল যেন পূর্ণ হইয়া গেল। গায়িকা গাহিতে লাগিল :—

"যে দিন পরাণে তোমার মধুর মুরতি জাগে—
সে দিন অমিয় উৎস বহে হৃদয় মাঝে ;
সে দিন নন্দন-বন কুসুম-গন্ধ
পবন মাখিয়া ধায়—
সে দিন বন বিহঙ্গ ঢালে সুধারাশি
তোমারই অনুরাগে।
সে দিন নিখিল বিশ্ব সাজে মোহন সাজে,
সে দিন হৃদয়ে তোমার মধুর রাগিণী বাজে
আমি পাগল হইয়া শুনি সেই গান প্রাণের আবেগে।"

শরৎ সহসা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"একি বেলা—অমিয়-উৎস ? এ যে সেই কণ্ঠস্বর—" শরতের আর বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। তাহার সংজ্ঞাশূন্য দেহ রাজেন্দ্রের বক্ষের উপরে ঢলিয়া পড়িল।

২৯

যখন শরতের সংজ্ঞালাভ হইল, তখন তিনি দেখিলেন, যে, তিনি সেই কৌচের উপরে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার কাছে ব্রজেন্দ্র বাবু, হরনাথ বাবু, রাজেন্দ্র, রাজেন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর হরেন্দ্র, হরনাথবাবুর পুত্র সনৎ প্রভৃতি দাঁড়াইয়া আছেন। অদূরে ঈষৎ অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া কল্যাণী হরনাথ বাবুর পত্নী, বড়মা এবং তাঁহাদের পশ্চাতে ব্রীড়াবনতমুখে বেলা দাঁড়াইয়া আছেন। হলঘরে আর পূর্ব্বের ন্যায় স্তিমিত আলোকে আধ আঁধার আধ আলোক নাই, উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত।

শরৎকে চক্ষু চাহিতে দেখিয়া হরনাথ বাবু সস্নেহে বলিলেন—

"বাবা শরৎ, এখন কেমন আছ ? শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ হইতেছে কি ?" হরনাথ বাবুর কথা শুনিয়া শরৎ ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ব্রজেন্দ্র বাবু বাধা দিয়া বলিলেন—

"না বাবা তাড়াতাড়ি কর না। একটু শুয়ে থাক তার পরে উঠ এখন।"

শরৎ সলজ্জভাবে বলিলেন—

"আমার আর কোন অসুখ নাই, বেশ আছি। কিন্তু আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি কোথায়? আপনারাই সকলে কোথা হতে এখানে এলেন? কবে এলেন?"

এই বলিতে বলিতে উঠিয়া বসিলেন এবং কৌচ ছাড়িয়া ব্রজেন্দ্র বাবু ও হরনাথ বাবুকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের পদ-ধূলি গ্রহণ করিলেন। পরে রাজেন্দ্রের জননীর নিকটে গিয়া তাঁহাকে এবং পরে বড়মাকে ও হরনাথ বাবুর পত্নীকে প্রণাম করিলেন।

কল্যাণী বলিলেন—

"পাগল ছেলে, মাকে লুকিয়ে কোথা গিয়েছিলি বাবা?"

রাজেন্দ্র অগ্রসর হইয়া জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"মা! শরৎ যখন বিলাত যায়, তখন বোম্বাই থেকে তার চিঠি পেয়ে কি বলেছিলেম মনে আছে ত? আমি বলেছিলেম, শরৎ যেমন আমাকে লুকিয়ে এত বড় কাজটা কল্লে, তখন আমিও সহজে ছাড়ব না, আমি মায় সুদে—এর শোধ দিব। এইবার শরৎ দেখুক, আমি সুদ সুদ্ধ শোধ দিতে পেরেছি কি না? ব্যারিষ্টার সাহেব কত লুকোচুরি জানে? উকীলের কাছ থেকে একটু লুকো-চুরি শিখুক।"

বড় মা একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—

"যেমন শরৎ তেমনই রাজু, দুট-ছেলেই সমান দুষ্টু। শরৎ আজ যে চার পাঁচ দিন এখানে এসে আছে, তা কেউ আমাকে ঘুণাক্ষরেও জানায় নাই।"

"রাজেন্দ্রের জননী বলিলেন, আমিই কি শুনেছিলেম? আজ সন্ধ্যের সময় রাজু আমাকে সব কথা খুলে বল্লে।"

শরৎ রাজেন্দ্রকে জনান্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তুমি গয়া থেকে কবে ফিরলে?"

রাজেন্দ্র বলিলেন,—

"গয়াতে আবার কার পিণ্ডি দিতে যাব?" আমি ত বরাবর এইখানেই আছি। বাবা মা সকলেই এখানে আছেন। বড় মা আজ ৮।১০ দিন হ'ল কাশী থেকে এখানে এসে আমাদের কাছেই আছেন।"

বড় মা বলিলেন,—

"হাঁরে শরৎ তুই বেলাকে বিয়ে করবার জন্য সেই সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে বিলেত গিয়েছিলি? আমাকে সব কথা খুলে বলিস্‌নে কেন? হরনাথ যে আমার মামাত বোনের দেওর। ওরা যে আমাদের করণীয় ঘর। তুই মুখের কথা খুললেই ত কোন্‌কালে তোর বিয়ে হয়ে যেত। এত দিনে আবার বেলা আমার বৌমা হয়ে খোকা কোলে ক'রে ঘর আলো করে বেড়াতেন।"

বড় মার 'কথা শুনিয়া শরৎ এবং বেলা উভয়েই

লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। তখন হরনাথবাবু বেলার হাত ধরিয়া শরতের নিকটে আসিয়া বলিলেন,—

"বাবা শরৎ তুমি যে বেলাকে কিরূপ প্রগাঢ় ভালবাস তা আমি রাজেন্দ্রের মুখে সমস্ত শুনেছি,—আর আজ তার প্রমাণও স্বচক্ষে দেখ্‌লেম। তোমাকে জামাতা করিবার ইচ্ছা প্রথম দর্শনে হইলেও তত সাহস কর্ত্তে পারি নাই। আজ আমার সাহস হয়েছে, তাই আজ আমার প্রাণের কন্যা বেলাকে তোমার হাতে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হলেম। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা উভয়ে দীর্ঘ জীবন, অক্ষুন্ন স্বাস্থ্য এবং নির্ম্মল আনন্দ লাভ কর,—সুখী হও, সকলকে সুখী কর।"

এই বলিয়া এক হাতে বেলার ও অন্য হাতে শরতের হস্ত ধারণ করে বেলাকে শরতের হস্তে সমর্পণ করিলেন। শরৎ ও বেলা উভয়ে কি জানি কাহার ইঙ্গিতে নত জানু হয়ে প্রথমে হরনাথ বাবুকে ও তাঁহার অন্যান্য গুরুজনদিগকে প্রণাম করিলেন। এমন সময় কক্ষান্তর হইতে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিল। শঙ্খধ্বনি শুনিয়া রাজেন্দ্রের জননী সহাস্যে বলিলেন,—

"আমাদের বৌমা বুঝি, বেটী শাঁক হাতে করে কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল।"

# আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

য়ুরোপ প্রভৃতি মহাদেশে "ছয়-পেনি"—"সাত-পেনি"-সংস্করণ প্রভৃতি নানাবিধ সুলভ অথচ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হয়—কিন্তু, সে সকলও পূর্ব্ব প্রকাশিত অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের পুস্তকাবলীর অন্যতম সংস্করণ মাত্র। বাঙ্গালাদেশে—পাঠকসংখ্যা বাড়িয়াছে, আর বাঙ্গালাদেশের লোক—ভাল জিনিষের কদর বুঝিতে শিখিয়াছে; সেই বিশ্বাসের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা এইরূপ সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমাদের চেষ্টা যে সফল হইয়াছে, 'পল্লী-সমাজের' এই সামান্য কয়েক মাসের মধ্যে পঞ্চম সংস্করণ, 'অভাগী'র ৪র্থ সংস্করণ এবং বড়বাড়ী, অরক্ষণীয়ার তৃতীয় সংস্করণ ও অনেকগুলিরই ২য় সংস্করণ ছাপিবার প্রয়োজন হওয়াই তাহার প্রমাণ।

বাঙ্গালাদেশে—শুধু বাঙ্গালা কেন—সমগ্র ভারতবর্ষে এরূপ নূতন সুন্দর সংস্করণের আমরাই সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক। মফঃস্বল-বাসীদের সুবিধার্থ অপ্রকাশিতগুলির জন্য নাম রেজেষ্ট্রী করা হয়; যখন যেখানি প্রকাশিত হইবে ভিঃ পিঃ ডাকে ৷৵৹ মূল্যে প্রেরিত হইবে। প্রকাশিতগুলি একত্রে লইতে হয়, বা পৃথক্ পৃথক্ সুবিধামত পত্র লিখিয়াও লইতে পারেন।

এই গ্রন্থমালায়

প্রকাশিত হইয়াছে—

১। অভাগী (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন
২। ধর্ম্মপাল (২য় সংস্করণ) শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ
৩। পল্লী-সমাজ (৫ম সংস্করণ) শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৪। কাঞ্চনমালা (২য় সংস্করণ) শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্, এ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা